

ঝুমরা বিবির মেলা

রমাপদ চৌধুরী

সত্যব্রত লাইব্রেরী
১১৭, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

প্রথম সংস্করণ
২৫শে শ্রাবণ, ১৩৬২

প্রকাশক
সত্যব্রত গুহ
১৯৭, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদপট
সমীর সরকার

প্রচ্ছদপট ছেপেছেন
মোহন প্রেস
১, করিশচার্চ্চ লেন
কলিকাতা—৯

ছেপেছেন
ধীরেন দত্ত
নবীন প্রেস
৬, কলেজ রো
কলিকাতা—৯

আড়াই টাকা

ঝুমরা বিবির মেলা

করুণকন্যা

রুমাবাঈ

বাসুকি বসুন্ধরা

পরজ বসন্ত

দুধের স্বাদ

সতী ঠাকরুণের চিতা

মেকি

কাক কোকিল

মনবন্দী

রেবেকা সোরেনের কবর

সাগরময় ঘোষ
প্রিয়বরেষু

ঝুমরা বিবির মেলা

দারোগা অবিনাশবাবু বললেন, "নির্ঘাত বাপবেটায় রেষারেষি হয়েছিল কোন—"

কথা আর শেষ করতে হ'ল না। রেঞ্জার অমিয়বাবুও হাসলেন—"অসম্ভব নয়, বুড়ো এই বছরখানেক আগে নাকি ষোল-সতের বছরের একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিল।"

থানার সিপাই কালী মণ্ডল বললে, "স্যার, নিজেই যখন সারেণ্ডার করেছে তখন ব্যাপারটাও জানা যাবে, কিন্তু ডাকাত ব্যাটা মরে ঠকিয়ে গেল স্যার।"

বুধন কিস্কুর মৃত্যুতে বিশেষ ক'রে দারোগা অবিনাশবাবুই ঠকে গেলেন। এতদিনের তল্লাস-তদন্ত সব ব্যর্থ হয়ে গেল।

ময়নাগড় থেকে বরকাডিহি, সারা কোলিয়ারী অঞ্চলটার অধিবাসীরা ভয়ে কাঁপতো দুর্ধর্ষ ডাকাত বুধন কিস্কুর নামে। ভুভুক্ষু চাষীরা বলতো, ঝুমরা বিবি ডাইন হয়ে বুধনকেও শিখিয়ে দিয়েছে ঝাড়নি মন্তর। মারাং বুরুর পূজো দিয়ে সিদ্ধাই হয়েছে বুধন, আর তাই শালাই গাছের মাথায় চড়ে শোঁ শোঁ ক'রে উড়ে গিয়ে আজ এখানে কাল সেখানে ডাকাতি নয়তো রাহাজানি ক'রে ফিরে আসে। থানা-হাকিমের সাধ্য নেই যে বুধনের টিকিতে হাত দেয়।

টিকি অবশ্য ছিল না বুধনের, বাপের মত ঝুরও রাখতো না। বুধন কিস্কু নামটাই ঘুরতো লোকের মুখে মুখে। কিন্তু আসল চেহারাটা কেউই দেখেনি। দেখে থাকলেও এমন বুকের পাটা কারও ছিল না যে পুলিশের কাছে সে-কথা জানায়। একরামপুর থানার দারোগা অবিনাশবাবু তাই হার মেনেছিলেন। আর সরকারী ডাক লুঠের পর ঝুমরা বিবির মেয়ে

আসমিনার খুনের তদন্ত করতে করতে যখন প্রায় বুধন কিস্কুর সব ঘাঁটিগুলো জানা হয়ে গেছে, সোনাডির চারদিকে প্লেন ড্রেস বসানো—শুধু গ্রেপ্তারের অপেক্ষা, সেই সময় কিনা—

ছেলের ঘাড়ে টাঙির কোপ তো নয়, যেন অবিনাশবাবুর প্রোমোশনের পায়েই কুড়ুল বসিয়ে দিলে বুড়ো মিঞামাঝি।

অবিনাশবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সারাটা জীবন এই একরামপুরের জঙ্গলেই কাটাতে হবে দেখছি। বুধনের দলেরই একটা লোক এসে খবর দেবে আর হাতে হাতকড়া পরাব ভেবেছিলাম। তা বদলির আর আশা নেই দেখছি।"

নিরাশ হবারই কথা। যে জঙ্গলে এক বছরের বেশি কোন দারোগা টিঁকতো না সেই বুনো তল্লাটে অবিনাশবাবুর জীবনই শেষ হতে চললো।

ছোট ছোট টিলার ঢেউ ময়নাগড় থেকে বরকাডিহি অবধি। আর শাল-শালাই, মহুয়া আর আমলকীর গভীর জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট সাঁওতালী গ্রাম। মাঝপথে একটা রোগা নদী—সোনাতুলসী। সোনাতুলসীর পারে খানকয়েক বাংলো। ফরেস্ট অফিসার ও তাঁর সহকারীদের দপ্তর-আবাস, বদলি হলেও যাঁদের সেই এক অরণ্য থেকে আরেক অরণ্য। কিন্তু অবিনাশবাবু তো বদলি হয়ে আধা-শহর ময়নাগড়ে যেতে পারতেন—কিংবা বরকাডাঙাতে। তা নয়, এই জঙ্গলের মধ্যে থানা-হাকিম হয়ে শুকনো সেলামে পেট ভরানো।

কাছাকাছির মধ্যে সোনাতুলসীর ওপারে ছোট একটি গ্রাম। পাহাড়ের ঢালু উপত্যকায় দু'চার বিঘে লাল মাটির ক্ষেত, আর দু'দশ ঘর তুড়ুক চাষী। তুড়ুক, অর্থাৎ মুসলমান।

বোধ হয় কোন প্রাচীনকলে তুর্কী সৈন্যের আগমন ঘটেছিল এই অরণ্যাঞ্চলে, আর সেইজন্যেই মুসলমানদের নাম হয়েছিল তুড়ুক। যেমন হিন্দুদের নাম ছিল দেকো।

একরামপুরের তুড়ুক চাষীরা এককালে ছিল বনচর মানুষ। চাষের ক্ষেতে স্থায়ী ডেরা বেঁধে কিভাবে যেন মুসলমান হয়ে যায়। অবশ্য নামেই তুড়ুক, আচারে-বিচারে সিকিভাগ মুসলমানী, বারো আনা সাঁওতালী। মুখে সেই সাঁওতালী রঙ্, উর্দুর ছিটেফোঁটা মেশানো। দেবদেবী সেই কিঁসাড়

বোঙা, হাড়াম বোঙা, রামসাল্‌গি, লিটা, জমসিম বোঙা। কিন্তু ওপারের লোক যেমন বলতো সবচেয়ে বুড়া হ'ল সিঙে বোঙা, তেমনি তুড়ুকদের সবচয়ে বড় দেবতা এল্লা বোঙা।

সেই এল্লা বোঙার কসম খেয়ে বুড়ো মিঞামাঝি বললে, "হুজুর থানা-হাকিম মিছা বলবো নাই। থানা-হাকিম আপুনি, সাজাঁ দিবার হয় লটকে দে।"

লটকে দে, অর্থাৎ ফাঁসি দে।

শুনে হাসলেন অবিনাশবাবু—পাণ্ডে, সহায়, সিপাই কালী মণ্ডল।

আর হাসলেন অমিয়বাবু। বললেন, থানা-হাকিম! বেশ নামটি দিয়েছে কিন্তু।

দারোগা অবিনাশবাবু থানা-হাকিম, আর জমাদার গোবিন্দ সহায় ছিল দারোগা। বনপুলিশের দপ্তরে বসতেন ব'লে রেঞ্জার অমিয়বাবুর নাম ছিল জঙ্গল-সাহেব।

জঙ্গল-সাহেবের বাংলোর বারান্দায় বসেই যথারীতি গল্পগুজব চলছিল। রেঞ্জার অমিযবাবু, দারোগা অবিনাশবাবু, জমাদার গোবিন্দ সহায়, এফ ও হৃদয়নাথ পাণ্ডে এবং আরো ছু'চারজন চাপরাশী আর কনেস্টবল। বাইরে অমাবশ্যার অন্ধকারে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমক দিচ্ছিলো। অঝোর ধারায় বৃষ্টি তো নয় যেন আলকাতরার প্লাবন। গাছের পাতার খসখসানি, বৃষ্টির রিমঝিম আর বনফড়িঙের ঝিঁ ঝিঁ—এরই মাঝে হঠাৎ একসময় ঠুক ঠুক এসে হাজির হ'ল বুড়ো মিঞামাঝি।

একমনে খৈনী টিপছিল জমাদার গোবিন্দ সহায়, মেঝেতে ব'সে ব'সে। তারই সামনে এসে দাঁড়ালো বুড়ো।—সেলাম দার্গাসাহেব।

সরাসরি অবিনাশবাবুর কাছে এগিয়ে যাবার সাহস হ'ল না। শুধু গামছায় বাঁধা পুঁটলিটা সামনে নামিয়ে রাখলো সে।

টিমটিমে একটা লণ্ঠন জ্বলছিল বারান্দায়, তাই প্রথমটা বুঝতে পারেনি গোবিন্দ সহায়। ক্ষেতের খরমুজা দর্শনী এনেছে ভেবে বাঁ হাতে দুটো ফাঁপা তালি দিলে, তারপর খৈনী টেপা বন্ধ রেখে গামছাটা খুলেই আঁতকে উঠলো—"আরে রাম রাম সিয়ারাম; এতো তিন শ' দো নম্বর কেস আছে।"

অমিয়বাবু কিংবা পাণ্ডে তো দূরের কথা, অবিনাশবাবুও আঁতকে উঠে-ছিলেন। তারপর বললেন, এই বৃষ্টিবাদলের রাতে আলাদে দেখছি।

পরক্ষণে বুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে চিনতে পারলেন অবিনাশবাবু —"আরে সোনাডির মিঞামাঝি না?"

—হাঁ থানা-হাকিম। আপনরাই তো ল'টকে দিতিস হুজুর, তা বেটারে আমি কোঁপাই দিছি।

অবিনাশবাবু বুঝতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, "লট্‌কে দিতাম? কেন, কে তোর বেটা?"

—ডারীটা আনে দেখ্‌না। উ হলো আমার বেটা বুধন কিস্কু। দে হুজুর ল'টকে দে।

অবিনাশবাবু হাসলেন।—"বুড়ো-হাকিমের কাছে বিচার হবে তবে তো; ফাঁসি দিয়ে দেব এখনই? কিন্তু বুধন কে? ডাকাত বুধন কি তোর ছেলে নাকি?"

বুড়ো ঘাড় নাড়লে শুধু।—হাঁ।

অবিনাশবাবু গোবিন্দ সহায়কে বললেন, "বুড়োকে হাজতে রেখে ব্যবস্থা কর গোবিন্দ, মাথাটা এনেছে, ধড়টাও আনতে হবে তো।"

বুড়ো মিঞামাঝি বুঝলো কথাটা। বললে, "সে হুজুর সোনাডিতে আছে, বুড়ো হয়েছি, মুর্দা আনবার তাকত্‌ কুথায়? কিন্তু হাজত দিবি কানে হুজুর, ল'টকে দে। বোঙারা স্বপ্ন দিলেন বেটারে কুঁরবান দে; তো কুঁরবান দিছি, এখুন ল'টকে দে।"

ছেলেকে খুন করেছে, সুতরাং ফাঁসি দিলেই যেন বুড়োর শাস্তি।

কিন্তু অবিনাশবাবুর দুঃখ বুধন কিস্কুর গলায় ফাঁসির দড়িটা নিজেই তুলে দিতে পারলেন না।

গোবিন্দ সহায় জনকয়েক কনেস্টবল, সিপাই কালী মণ্ডল আর কোমরে দড়ি বাঁধা মিঞামাঝিকে নিয়ে চলে যেতেই অমিয়বাবু বললেন, "কি ব্যাপার বলুন তো? কেমন যেন রহস্য রহস্য ঠেকছে!"

অবিনাশবাবু হাসলেন—"ব্যাপার? ব্যাপার নয়, রীতিমত ইতিহাস।"

ইতিহাস সত্যিই।

তুড়ুক সাঁওতালদের গ্রাম সোনাডি। আর সে গাঁয়ের দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিল

বুধন কিস্কু। ময়নাগড় থেকে বরকাডিহি, সারা তল্লাটের যত খুনজখম, ডাকাতি, রাহাজানি সবকিছুর জন্তে লোকে দায়ী করতো বুধনকে। অথচ সাহস ক'রে কেউ কিছু বলতো না। লোকটা যে কেমন দেখতে, কোথায় থাকে, কার ছেলে, কোন খবরই পাওয়া যেতো না। আর কি ক'রেই বা পাওয়া যাবে। গাঁয়ের সাঁওতালরা বলতো, ও হুজুর ডাইনের মন্ত্র শিখেছে ঝুমরা বিবির কাছে। মারাং বুরুর নাম ক'রে এখনই মানুষ আবার এখনই হরিণ, নয়তো পাখি। হাওয়ায় নাকি উড়ে যেতে পারে বুধন, সোনাতুলসীর জলে মিশে যেতে পারে।

আরেকজনের কথাও লোকে বলতো। সে হ'ল হরকরা নির্মল সিং। নির্মল সিংও নাকি মন্ত্র শিখেছিল ঝুমরা বিবির মেয়ে আসমিনার কাছে, ঝুমুর ঝুম ঝুমুর ঝুম শব্দ ক'রে হাওয়ায় উড়ে যেতো সেও।

লাঠির মাথায় ঘুঙুর বাঁধা, পিঠে মেলব্যাগ নিয়ে ময়নাগড় থেকে বরকা-ডিহি ছুটতো নির্মল সিং। ঝুমুর ঝুম ঝুমুর ঝুম শব্দ আসতো সন্ধ্যের দিকে, আর মাঝে মাঝে টানাটানা চীৎকার স-র-কা-রী ডা-ক!

আবার ছুটতো নির্মল সিং, ঝুমুর ঝুম ঝুমুর ঝুম। পিঠের মেলব্যাগে থাকতো চিঠিপত্র, পার্সেল, টাকাকড়ি। শনিবারে শুধু মনি-অর্ডারই নয়, সেভিংস ব্যাঙ্কের টাকাও জমা পাঠানো হ'ত বড়ো ডাকঘরে।

ডাক হরকরার ওপর কেউ কোনদিন লোভের হাত বাড়ায়নি। কিন্তু হঠাৎ পরপর দুদিন নির্মল সিংয়ের ঘুঙুর বাজলো না। খবর এসে পৌছলো তৃতীয় দিনে।

রেঞ্জার অমিয়বাবু ভেবেছিলেন, লোকটা বুঝি বা এতদিনে অসুখে পড়লো।

কিন্তু অসুখ নয়, চিরনিদ্রা। সোনাতুলসীর পারে তল্লাস ক'রে পাওয়া গেল মেলব্যাগটা। হরকরার লাঠি আর মেলব্যাগ যেমনকার তেমনি পড়ে আছে, আর কাছেই একটি মৃতদেহ।

না নির্মল সিং নয়, আঠারো-বিশ বছরের একটি পূর্ণযৌবনা সাঁওতালী মেয়ে। কেউ যেন গলা টিপে মেরেছে তাকে।

গাঁয়ের লোক বললে, ঝুমরা বিবির মেয়ে আসমিনা। মায়ের মত মেয়েও ছিল ডাইন। নির্মল সিংকে বশ করেছিল মেয়েটা, লোভ দেখিয়েছিল, তারপর সুযোগ দেখে কলিজা বের ক'রে খেয়ে নিয়েছে। তাই নির্মল সিং

বাতাসে মিশে গেছে। ডাইনরা যখন মানুষের কলিজা খায় তখন আর চিহ্ন রাখে না।

কিন্তু আসমিনা মরলো কি ক'রে ?

বুড়োরা বললে, মা-মেয়ে দুই-ই ছিল ডাইন। মাকে ভাগ না দিয়ে নির্মল সিংকে খেয়ে নিয়েছে ব'লে ঝুমরা বিবি মেয়ের বুক চিরে কলিজা বের ক'রে নিয়েছে।

—তুরাতো হাসিস বাবুরা! ডাইন আছে কিনা পরখ দেখলি তো হাকিম? বুড়ো মিঞামাঝি বলেছিল অবিনাশবাবুকে।

বুড়ো মিঞামাঝি ছিল গাঁয়ের মাথা। বিঘে দুই-তিন জমি ছিল বুড়োর। অনারের চাষ করতো।

তার কাছে গিয়ে হাজির হলেন অবিনাশবাবু, সঙ্গে জমাদার গোবিন্দ সহায়, জনকয়েক কনেস্টবল আর সিপাই কালী মণ্ডলকে নিয়ে।

বললেন, তোরা সকলে মিলে সাহায্য না করলে এ ডাকাত ব্যাটাকে ধরা যাবে না।

বুধন যে মিঞামঝিরই ছেলে তা তো জানতেন না।

মিঞামাঝি দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা খাটিয়া পেতে দিলো বসবার জন্যে। তারপর বললে, ঝুমরা বিবিটাই আসামী হুজুর, ডাইনটাকে ল'টকে দে দেখবি বুধন ভালো হয়ে যাবে।

অবিনাশবাবু বুঝলেন কাজ হবে না এ ভাবে। রেঞ্জার অমিয়বাবুকে এসে বললেন কি করা যায় বলুন তো। লোকটার কোন হদিসই কেউ দিচ্ছে না। সবারই ভয় বুধনকে ধরিয়ে দিলে ডাইনে কলিজা খেয়ে নেবে তার।

সোনাডির লোকগুলোর ওপর নাকি বোঙাদের দৃষ্টি ছিলো আগে। তারপর এই ঝুমরা বিবি ডাইন হ'ল। অন্ধকার রাতে মন্ত্র প'ড়ে স্বামীকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে বেরিয়ে যেতো ঝুমরা বিবি। একটা ঝাঁটা রেখে যেতো স্বামীর কাছে। আর মন্ত্রের ঘোরে ঝাঁটাটা জড়িয়ে শুয়ে সে ভাবতো ঝুমরা বিবিই বুঝিবা শুয়ে আছে। ঝুমরা তখন কুলোর ওপর একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে বেরিয়ে যেতো।

গাঁয়ের অনেকে দেখেছে এ দৃশ্য, এল্লা বোঙার কসম খেয়ে বলতো তারা।

সে এক ভয়ঙ্কর চেহারা। কপালে চকচক করতো তেল-সিঁদুর, হাতে প্রদীপ, ঝুমরার কালো পাথরের শরীর দেখে মনে হতো যেন জোয়ান মরদের শক্তি তার হাতে। আর গুভিন মেয়ের মত তার ভারি লাজ দেখে যে পুরুষের মন চঞ্চল হতো তারই কলিজা মুঠোয় পুরে নিতো ঝুমরা। শুধু কি তাই, সব ডেরা ঘুরে ঘুরে কোথাও ভায়ে ভায়ে ঝামেলার মন্ত্র প'ড়ে আসতো, বাপ-বেটিতে পাপ লাগাতো, গোলার হুড়ুতে পোকা লাগিয়ে গাঁয়ের লোককে ভুখা মারতো।

বুড়ো মিঞামাঝি বলেছিল, "তখুন জানতাম না থানা-হাকিম, সত্যি ডাইন বটেক, কি ঝুটা।"

—কি ক'রে জানলি? সিপাই কালী মণ্ডল জিজ্ঞেস করেছিল।

মিঞামাঝি তার আধা-মাকুন্দ নূরে হাত বুলিয়ে বলেছিল, "ডাইন দেখলে চুপ থাকতে হয় জঙ্গল-সাহেব। তো জানের বিচার যখন বললে ঝুমরা ডাইন তখন গাঁয়ের সক্কলে বলে, আমরাও দেখেঁছি বটে।"

সেই ঝুমরা বিবির বশ হ'ল বুধন কিস্কু। বোঙাদের ধরম মানলো না, নিজেকে ভাসিয়ে দিল পাপের গাড়ায়।

দারোগা অবিনাশবাবুরও চোখ ছলছল ক'রে উঠেছিল অমিয়বাবুর কাছে সে কাহিনী বলতে বলতে।

বলেছিলেন, "কত দুঃখে যে মানুষ নিজের ছেলেকে কাটতে পারে বুড়োর কাছে না শুনলে বুঝবেন না অমিয়বাবু। ঠিগিয়া সাদী হওয়ার পর আধা-জীবন কেটে যেতেও নাকি ছেলেপিলে হয়নি মিঞামাঝির। না বেটা না বেটি। তারপর ছেলে দিয়েই মারা গেল মিঞামাঝির প্রথম বৌ।"

—তারপর?

—মা না থাকলে বাপের আদর পেয়ে যা হয়। বুধন কিস্কু চাষবাস ছেড়ে শিকার ক'রে বেড়ায়। ছোটখাটো চুরি-জোচ্চুরী করে। তবু বাপ শক্ত হতে পারে না। শেষে ছেলে যখন জোয়ান হ'ল, পঞ্চায়েৎ বললে, বিধবা ঝুমরা বিবির সঙ্গে বুধনের পীরিত হয়েছে। ভয় দেখিয়ে জরিমানা ক'রে কোন কিছুতেই যখন কাজ হ'ল না, তখন সবাই বললে, "ঝুমরা বিবি ডাইনী। ওকে গাঁ থেকে তাড়াতে হবে।"

অমিয়বাবু বললে, "শুধু দুটো জিনিসই দেখছি ওদের জীবনে সত্যি, বোঙা আর ডাইনী।"

অবিনাশবাবু বললে, "কিন্তু ডাইনী বললেই তো হবে না, জানের কাছে বিচার হলে তবে। ওঝার কাছে খাড়ি গুনিয়ে তারপর ধুনো সুপুরি ভাঁউনিচ নিয়ে যেতে হবে জানের কাছে।"

হাতে হাতকড়া, কোমরে দড়িবাঁধা অবস্থায় স্টেটমেণ্ট দিচ্ছিলো বুড়ো মিঞামাঝি। অবিনাশবাবুর কথা শুনে বললে, "হাঁ হুজুর, জানে সব ঠিক ঠিক বললে, পরে বুন্দা চাইলে। বুন্দার টাকা দিলাম তো বললে বেটার মাথায় ডাইন ভর করেছে। তো পুছলাম ডাইন আছে কোন ওড়ায়? জান ঠিকানা বললে। তল্লাস ক'রে ঝুমরা বিবি ডাইন হ'ল তো গাঁয়ের লোক হড়মদড়ম মার দিলে, বে-আব্রু ক'রে ভাগায় দিলে মা-বেটিরে।"

অগত্যা গাঁয়ের বাইরে গিয়ে ডেরা বাঁধলে ঝুমরা।

সেই ঝুমরা বিবির খোঁজে লোক পাঠালেন অবিনাশবাবু। কিন্তু পরপর তিন দিন কোন খোঁজ পাওয়া গেল না তার। শেষে বুধন কিস্কুর ডেড বডি আর বুড়ো মিঞামাঝিকে চালান ক'রে দিতে হ'ল বরকাডিহিতে।

দিনকয়েক পরে ঝুমরা বিবি ফিরে যখন শুনলো বুড়ো মিঞামাঝি টাঙির কোপে কেটে ফেলেছে তার ছেলে বুধন কিস্কুকে, তখন কেঁদে গড়িয়ে পড়লো সে।

চোখের জল মুছে বললে, "লটকা হবে তো হুজুর ঐ বুড়োটার?"

অবিনাশবাবু স্বভাবসুলভ রসিকতায় বললেন, "কেন বাবা, বুধন কে ছিল তোমার যে তার বাপকে লটকে দিতে চাও?"

ঝুমরা চেখের জল মুছে বললে, "হুজুর, বুধনই বাঁচায় রাখছিল আমাদের। না হলে ভুখা মরতাম থানা-হাকিম।"

—তবে সতী ঠাকরুন, মেয়ে যখন মরে পড়েছিল সোনাতুলসীর পাড়ে, তখন কেন বুধন কিস্কুর নামে ডায়েরি লিখিয়েছিলে?

সবটা হয়তো বুঝলো না ঝুমরা, তবু যেটুকু বুঝলো সেইটুকুতেই অপ্রতিভ হ'ল।

বললে, "সে হাকিম আনেক কথা।"

যত চোখের জল মোছে ঝুমরা, ততই জলে ভরে আসে তার চোখ।

গাঁয়ের লোক বিটলা ক'রে গাঁয়ের বাইরে তাড়িয়ে দিলে কি হবে, বুধন কিন্তু তার মন থেকে তাড়াতে পারেনি ঝুমরা বিবিকে।

অমিয়বাবু হেসে বললেন. "পীরিত বটে। ওর চেয়ে দশ বছরের বড়ো এ মাগীটা, তার সঙ্গে কিনা ....."

অবিনাশবাবু হাসলেন।—যার সাথে যার মজে মন—

ফরেস্ট অফিসার পাণ্ডে বললে, "সাচ্ অবিনাশবাবু। আগে পানি পিয়ে পিছু জাতি বিচারে।"

তা এখানে জাত তো একই, তফাৎ যেটুকু তা শুধু বয়সের। তাছাড়া ডাকাত বুধন ছিল ব'লেই না ঝুমরা বিবি ভুখা মরেনি। মেয়েকে নিয়ে গাঁয়ের বাইরে ও যখন ডেরা বাঁধলে তখন ওর না আছে জমি, না চাঁদি। আর পয়সা দিলেও কেউ এক কণা চাল বেচত না ওকে। সেই সময় বুধন কখনো কখনো মাঝরাতে একা হাজির হ'ত। চাল ডাল সোনা-দানা, লুটের মাল খানিকটা এনে দিতো ঝুমরা বিবিকে। হাঁড়িয়া খেয়ে ঝুমরা বিবির সঙ্গে রাত কাটাতো, আর উধাও হ'তো ভোর চমক দেবার আগেই।

সে-সব দিনের কথা বলতে বলতে হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলে ঝুমরা।

বললে, "হাঁড়িয়া খেলেই মনের ভিতরটা বেয়াদপ হয়ে যায় থানা-হাকিম। ভালো মানুষটা পাপী হয়ে যায়।"

অর্থাৎ মনে পাপ ঢোকে। বুধনের মনেও একদিন সেই পাপ ঢুকলো। হঠাৎ একদিন মাঝরাতে এসে বুধন-ডাকু হাঁড়িয়া চাইলে। তারপর নেশা যখন জমে উঠছে, তখন হঠাৎ ঝুমরাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলে। বললে, বেটিকে লিয়ে আয়।

—ডাকু নেশা করলে হুজুর বাঘের মত তেজ হয়। ঝুমরা বিবি বললে।

অবিনাশবাবু বললেন, "আর তাই মেয়েকে এনে দিলি, কেমন ?"

ঝুমরা বিবি লজ্জায় মাথা তুলতে পারলো না।

—তারপর ?

তারপর বুধন যখনই আসতো, হাঁড়িয়া চাইতো। আর হাঁড়িয়া খেয়ে রাত কাটাতো আসমিনার সঙ্গে। শেষে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যেবেলায় এসে হাজির হলো। বললে, বেটিকে নিয়ে আয়।

অমিয়বাবু বললেন "বাঃ, বেশ ইণ্টারেষ্টিং ব্যাপার তো।"

অমিয়বাবু হাসলেন।—তারপর? ডেকে আনলি আসমিনাকে?

ঝুমরা বিবি মুখ তুললো এতক্ষণে। বললে, "না হুজুর। আসমিনা সাঁঝের বেলায় সোনাতুলসী থেকে পানি আনতো। তো বেটি গাড়ায় পানি আনতে গেছে শুনে টাঙিটা লিয়ে চল গেল বুধন। তারপর তো তুরাই জানিস হুজুর।" ব'লে কাঁদলে ঝুমরা ঠিক সেদিন মেয়ের মৃতদেহের ওপর লুটিয়ে প'ড়ে যেভাবে কেঁদেছিল।

সব শুনে অবিনাশবাবু বললেন, "তবে আবার বুধনের বাপটাকে লটকে দিতে চাস কেন? মরেছে ভালই হয়েছে।"

ঝুমরা বিবি চলে যেতেই অমিয়বাবু বললেন, "ফাঁসি হবে?"

—পাগল হয়েছেন? হাসলেন অবিনাশবাবু। বললেন, বছর কয়েক জেল অবশ্য হবেই।

দিনকয়েক পরে বরকাডিগি থেকে ফিরে এসে বললেন, জেলই হ'ল অমিয়বাবু, চার বছর। বুড়ো মিঞামাঝি এমন স্টেটমেণ্ট দিলে যে, কোর্টশুদ্ধ লোকের চোখে জল এলো।

—কি বললে? উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন অমিয়বাবু।

—বললে, হুজুর জন্ম দিয়েছি আমি, জীবনও নিয়েছি আমি। এখন আইনে ফাঁসি দিতে হয় দে। যে ছেলেকে কোলেপিঠে ক'রে আদর-যত্নে মানুষ করেছি সে যখন ভালো হ'লো না, ডাকাতি রাহাজানি করে, মেয়েদের বেইজ্জৎ ক'রে এল্লা বোঙার কাছে বেইমান হ'ল তখন তাকে কেটে ফেলবো না তো মুর্গি বলি দিয়ে তার পূজো করবো!

অমিয়বাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কথাটা ঠিকই।

ক্ষোভের হাসি হাসলেন অবিনাশবাবু। "ওর বেটার নাকি দোষ ছিল না, ডাইনীর বশ হয়েছিল। কিন্তু রায়ে জেল হয়েছে শুনে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে শুরু করল বুড়ো। ভাবলাম, ফাঁসি হবার জন্যে এত আগ্রহ যার সে-লোক জেল হয়েছে ব'লে কাঁদে? জিজ্ঞেস করলাম তো বললে, হুজুর হিসাব ভুল হয়ে গেছে। লটকা না হ'লে বোঙারা খুশী হবেন নাই, বুধন ভালো হবে নাই।"

একটু চুপ ক'রে থেকে অবিনাশবাবু বললেন, "বোধ হয় পাগল হয়ে গেছে ছেলেকে খুন ক'রে। কিন্তু ডাইনী ভোলেনি।"

পাণ্ডেও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "বিশোয়াস্, অমিয়বাবু।"

বিশ্বাস!

সত্যিই তাই। অদ্ভুত মানুষ এই তুড়ুক চাষীরা। একবার যা বিশ্বাস করে সারা জীবনেও তার নড়চড় হবে না, অমিয়বাবু বলতেন। বলতেন নতুন দারোগা সুধীনবাবুকে।

অবিনাশবাবু বরকাডিহিতেই বদলি হয়ে গিয়েছিলেন, আর তাঁর জায়গায় এসেছিলেন সুধীনবাবু।

খুনজখম বা ডাকাতি-রাহাজানির কেস এলেই বুধন কিস্কু আর বুড়ো মিঞামাঝির গল্প শোনাতেন অমিয়বাবু।

বলতেন, "সে এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড সুধীনবাবু। সন্ধ্যেবেলায় ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে, বসে গল্প করছি আমরা, হঠাৎ সেই সময় ঠুক-ঠুক ক'রে এসে হাজির হ'ল বুড়ো মিঞামাঝি, গামছায় ছেলের কাটা মুণ্ডুটা বেঁধে নিয়ে। সে কি আজকের কথা, সে প্রায় তিন-চার বছর হ'ল।"

সেদিনও এমনি কি একটা গল্প হচ্ছিল, হঠাৎ সিপাই কালী মণ্ডল ছুটতে ছুটতে এসে বললে, "সোনাডির একটা গাছে গলায় দড়ি লাগিয়ে একজন বুড়ো ঝুলছে স্যার।"

—আত্মহত্যা? সুধীনবাবু প্রশ্ন করলেন।

—হাঁা স্যার, সুইসাইড কেস। কালী মণ্ডল বললে।

অমিয়বাবু, সুধীনবাবু, পাণ্ডে, সবায় সকলেই বেরিয়ে পড়লো। হাঁটুজল সোনাতুলসী পার হয়ে এসে দেখলে, ভিড় ভেঙে পড়েছে গাছটার কাছে।

একটা সিপাই গাছে উঠে দড়িটা কেটে দিলো, ঝুপে ক'রে মাটিতে পড়লো মৃতদেহটা।

অমিয়বাবু ঝুঁকে প'ড়ে দেখলেন। বুড়ো থুত্থুড়ে একটা লোক, মুখের চামড়া জিলজিলে হয়ে গেছে।

কে যেন বললে, "জঙ্গল-সাহেব, কয়েদ মকুব হয়েছিল তাই সোনাডিতে ফিরে এসেছিল বুড়ো মিঞামাঝি।"

আরেকজন কে বললে, "ডাইনটা মন্ত্র প'ড়ে বুড়োকে লটকে দিয়েছে হুজুর।"

শুধু ঝুমরা বিবি বললে, "না হুজুর, ডাইন নই আমি। বেটা বাপের কথা রাখে নাই হুজুর, তাই গলায় দড়ি দিয়েছে বুড়ো। বেটা বুধন বলেছিল জান বাঁচায় দিলে রাহাজানি করবে নাই।"

অমিয়বাবু ধমক দিয়ে বললেন, "কি বলছিস যা-তা।"

সিপাই কালী মণ্ডল বললে, "ঠিকই বলছে স্যার। গাঁয়ের লোকও বলছে, বুধন কিন্তু বেঁচে আছে।"

—বুধন কিন্তু বেঁচে আছে? বিস্মিত না হয়ে পারেন না অমিয়বাবু।

কালী মণ্ডল বললে, "তা না হলে এত রাহাজানি হয় এখনো? ডাইনীটা বলছিলো, কে একটা লোক নাকি থানায় খবর দিতে আসছিলো, তাকেই তিনশো ছুই ক'রে দিয়েছিল বুধন। অথচ গাঁয়ের চারদিকে তখন পুলিশ।"

—তারপর?

—তারপর বাপের কাছে মাঝরাত্তিরে গিয়ে বলেছিল, এবার জান বাঁচিয়ে পালাতে দে, ডাকাতি ছেড়ে চাষবাস দেখবো। তা স্যার তুড়ুকই হোক্, সাঁওতালই হোক্, বাপের প্রাণ তো। সেই ডেড়-বডিটাই বুধনের ব'লে চালিয়ে দিল।

সুধীনবাবু অস্ফুটে বললেন, "স্ট্রেঞ্জ!"

কালী মণ্ডল বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ। বুড়ো ভেবেছিল খুনের দায়ে ফাঁসি হবে ওর। আর ফাঁসি হলে তখন বাপের কলিজা বেটার বুকে এসে ঢুকবে। ডাইনী তখন ছেলেকে দিয়ে যা খুশি করাতে পারবে না।"

অমিয়বাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "অন্ধবিশ্বাস! এইজন্যই উন্নতি হ'ল না লোকগুলোর!"

কালী মণ্ডলও দীর্ঘশ্বাস ফেললে,—"যা বলেছেন স্যার। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে লোকটা যখন ফিরলো, গাঁয়ের লোকদের নাকি চিনতেই পারেনি, একবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়েছিল।"

—তাই নাকি? বিস্মিত হ'লেন সুধীনবাবু।

—হ্যাঁ স্যার। কালী মণ্ডলের চোখও যেন ছলছল ক'রে উঠলো। বললে, বুড়ো নাকি ছুটে বেড়াতো আর বলতো, "লটকা হ'ল নাই, হিসাব ভুল হঁয়ে গেছে।" ফাঁসি হলেই যেন শান্তি পেতো বুড়ো।

আর সেইজন্যেই হয়তো নিজের গলায় নিজেই ফাঁসির দড়ি পরলে।

কিন্তু সোনাডির তুড়ুকরা বললে, না হুজুর, বেটার কলিজা খেয়ে মিঠা লেগেছিল ডাইনটার, তো বাপের কলিজাও খেয়ে নিছে।

এ ঘটনার পর বহু দিন মাস বছর পার হয়ে গেছে। একরামপুরের থানা উঠে গেছে বরকাডিহিতে, বন-পুলিশের দপ্তরে এসেছে নতুন লোক, সবাই ভুলে গেছে ঝুমরা বিবিকে, বুড়ো মিঞামঝিকে, ডাকাত বুধন কিস্কুকে। কিন্তু সোনাডির তুড়ুক চাষীরা ভোলেনি সে ঘটনা। এখনও শীতকালের দিনে সারা গাঁয়ের লোক মেলা বসায়—ঝুমরা বিবির মেলা। মেয়েপুরুষ সকলে দিনরাত নাচে-গায়, দোকানীদের সারি বসে—মিঠাই মাণ্ডা, রঙ্গিন কাচের জল-চুড়ির। আর ভিড় ভেঙে পড়ে মোরগ-লড়াইয়ের দিনে। চারপাশের লোক ছড়া বাঁধে, গান গায় ঝুমরা বিবি আর মিঞা-মাঝির নামে। এল্লা বোঙার পূজো দিয়ে একটা মোরগের নাম দেয় ঝুমর আর অন্যটা মিঞামাঝি—তারপর দু'জনেরই পায়ে ছুরি বেঁধে ছেড়ে দেয়।

যে বছর 'ডাইন' মরে, আনন্দ ধরে না আর গাঁয়ের লোকের। আর যেবারে 'মিঞামাঝি' মোরগটার চোট লাগে, সেবারে এল্লা বোঙার পূজো চলে সাত দিন ধরে। গাঁয়ের লোকের মুখ শুকিয়ে যায়।

কিন্তু মিঞামাঝির সন্তানস্নেহের দিক্‌টা চোখে পড়ে না ওদের। ছেলের জান বাঁচাবার জন্যে, ছেলেকে ভাল করবার জন্যে বাপ নিজের গলায় ফাঁসির দড়ি লাগাবে—এই তো সাধারণ নীতি। এ ব্যাপারে বিস্মিত হবে কেন সোনাডির তুড়ুক চাষীরা।

আমি নিজেও দেখেছি এ মেলা, ঝুমরা বিবির মেলা। দেখেছি সোনাডির মোরগ-লড়াই। এখন একে গল্প বলতে হয় গল্প বলুন, ইতিহাস বলতে হয়, ইতিহাস।

বরুণবালা

শুধু প্রথম কেন, প্রথম দিকের যে কোন একটা পরিচ্ছেদের পাতায় চোখ ফিরিয়ে আনতে বললে অরুন্ধতীর অসম্মতি নেই। কিন্তু, তারপর, একটার পর একটা পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে জল-থৈ-থৈ পদ্মার পারে এসেই ভয়ে আঁতকে ওঠে ও। অন্ধকার সমুদ্রে এসে চোখ বোজে।

বিশাল বিস্তীর্ণ পদ্মার ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে, আর রাত-গভীরের দৃষ্টি-হারানো অন্ধকার। অনেক দূরের বাঁকে আর নদীজলের মাঝডাঙিতে দুটো আলোর নিশানা দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলছে, নিভছে; যেন ইশারায় কথা বলছে দূরের স্টিমারের সঙ্গে। চতুর্দিকে শুধুই অন্ধকার, অন্ধকারের পাড়ে সোনালী জরির তারার মত একসারি টিমটিমে আলো। মাঝি ঘুমন্তির ঘাটে সারি সারি নৌকোর লণ্ঠন হয়তো। দূরের চলন্ত স্টিমার থেকে ভেসে আসছে একটা মৃদু একটানা আওয়াজ, আর স্টিমারের ফণায় সার্চলাইটের মণিটা অবিরত ঘুরে চলেছে এদিকে ওদিকে, অন্ধকার ভেদ ক'রে।

অরুন্ধতীর বেশ মনে আছে। মনে না থাকলেই যেন ভাল হ'ত।

হিজল ঝোপের আড়ালে আড়ালে নিঃশব্দ পায়ে পালিয়ে চলেছে ওরা। বাবা, মা, ভাই, বোন,—সকলেই। দূরে দূরে দু'একটা আলেয়া জ্বলে উঠছে থেকে থেকে। আর নিস্তব্ধতার মাঝে টুপ্ টুপ্ ক'রে হিজলের ফল পড়ছে জলে—মনে হচ্ছে, কারা যেন চাপা গলায় কথা বলছে। কথা নয়, জলের বুকে হিজলের ফল পড়ার শব্দ জেনেও ভয়ে আশঙ্কায় নিঃশ্বাস চেপে থেমে পড়ছে ওরা।

হাঁ, থেমে পড়তেই হ'ল শেষ অবধি। হৈ হৈ ক'রে একটা উন্মত্ত বিভীষিকার দল এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো। অরুন্ধতীর জীবনে শুরু হ'ল নতুন একটি পরিচ্ছেদ।

একটি নয়, কয়েকটি পরিচ্ছেদ।

সে-সব দিনের কথা ভাবতে চায় না অরুন্ধতী। ভুলতে পারলেই যেন বেঁচে যায়। কিন্তু, অরুণি, অরুন্ধতী ভুলতে চাইলেও পৃথিবী ভুলে থাকবে কেন!

জীবনের স্রোত থামিয়ে দিয়ে নোংরা জলে মুখ গুঁজে থাকতে চেয়েছিল অরুন্ধতী। ভেবেছিল, নোঙর তোলার সম্ভাবনাই যখন নেই, চোখে কল্পনার রঙ বুলিয়ে কি হবে? তার চেয়ে ভালো-না-লাগার ঘরকেই মায়া-মমতার নরম গরম পালক দিয়ে চেপে ধরতে দোষ কি! এত শত ভেবেই না শেষ অবধি ঘৃণার স্বামীকে বিনা বাধায় গ্রহণ করেছিল ও। স্বামী? শব্দটা মনে পড়লেও বিদ্রূপে বেঁকে যায় ওর ঠোঁটের হাসি। তবু সেই অসুর-প্রেমের অযাচিত সন্তানকে মাতৃত্বের স্বীকৃতি দিয়েছিল, স্নেহে প্রীতিতে।

বাইরের পৃথিবীতে কোথায় কি ঘটছে খবরই রাখতো না অরুন্ধতী। কোন খবরই এসে পৌছতো না ওর কাছে। পাতালপুরীর বন্দিনী দুঃখকন্যার মত সব আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়ে মনকে শক্ত করবার চেষ্টা করছিল শুধু। নিজের ব'লে মনে হয় না এমন এক ছোট্ট ঘরের অন্ধকার কোণে মুখ লুকিয়ে, মন লুকিয়ে।

তারপর হঠাৎ একদিন দারোগা-পুলিশ এলো, এক রাজ্যের অন্তরীণ যেন অন্য রাজ্যের খাঁচার কপাট খোলা পেলো। ফিরে এলো অরুন্ধতী, কিন্তু সেই পুরোনো দিনের সুখ-সংসারে নয়। তবু মুহূর্তকয়েকের জন্যে, রিক্ত বালিয়াড়ির গায়ে কয়েক টুক্‌রো খুশির অভ্র চিকচিক ক'রে উঠলো। না-বোঝা-প্রশ্ন চাপা পড়ে রইলো ভাই-বোনের মনে, ফিরে পাওয়ার আনন্দেই ওকে জড়িয়ে ধরলে তারা। মা'র মুখ উজ্জ্বল হ'ল না সত্যি, কিন্তু বোঝা গেল, অনেক ঝড়-সওয়া ঐ পাথুরে মুখ আসলে মিথ্যার মুখোসে ঢাকা। এত বছর বাদে মেয়েকে ফিরে পেয়ে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে চাইছেন তিনি, কিন্তু অরুন্ধতীর কোলের ছোট্ট এক টুক্‌রো ঐ শিশু মা-মেয়ের মাঝখানে মস্ত বড় একটা দেয়াল তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

শুধু কি মা?

পাড়াপড়শিদের কানে কানেও খবর রটতে দেরী হ'ল না। তবু মজা দেখবার জন্যেই হয়তো, এমন ভাব দেখালে তারা যেন কিছুই জানে না। এমন কপট

হৃদ্যতার ভাষায় কথা বললে, যেন অরুণির মা নতুন আসেননি এ পাড়ায়, নতুন পরিচয় নয় তাদের সঙ্গে।—শ্বশুরবাড়ী থেকে মেয়ে এসেছে বুঝি? সরলতম চোখে প্রশ্ন করলো হয়তো কেউ।

এ প্রশ্নের আর কিই বা জবাব দেওয়া যায়। চুপ ক'রে রইলেন অরুন্ধতীর মা, অনেকক্ষণ। মাথা হেঁট করলেন ম্লান মুখের অস্বস্তি ঢাকবার জন্যে। শেষে অনেক চেষ্টায়, চোখের জল চেপে শুধু বললেন, দাঙ্গায় হারিয়ে গিয়েছিল।

—ও মা, তাই নকি? সমবেদনায় সহানুভূতিতে চট্ ক'রে সবাই চোখ সজল ক'রে তুললো।—কি রক্তখেকো দাঙ্গাই যে লেগেছিল দিদি! চোখে কাপড়ের পাড় ঘষলো তারা।

কে একজন বললে, যাক্ ভালোয় ভালোয় যে ফিরে পেয়েছেন দিদি, এই খুব।

বিদ্রূপটা বুঝতে পারলেন অরুন্ধতীর মা, কোন উত্তর দিতে পারলেন না।

অরুন্ধতীও শুনছিল কপাটের আড়াল থেকে। আর লজ্জায় গ্লানিতে মাটিতে মিশে যেতে চাইছিল ও। গ্লানি নিজের জন্য নয়, ও কি করবে, অন্য কোন পথ ছিল নাকি ওর সাম্‌নে। কিন্তু ওর জন্যে মা মুখ তুলতে পারবে না, এ কথা তো কৈ কোনদিন মনে হয়নি।

মনে হয়নি? ভাবেনি কোনদিন? তা হ'লে সেদিন দারোগা-পুলিশের পায়ে কেঁদে লুটিয়ে পড়েছিল কেন? কেন বলেছিল, ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন না আমাকে, আমি বেশ আছি, সুখে আছি।

এতগুলো অনুনয়ের পিছনে তো একটাই কথা ছিল, একটাই ভয়। ফিরে গেলেও কি আবার সব ফিরে পাবো? বাবা, মা, ভাই, বোন—সকলেই কি ফিরে নেবে আমাকে?

মনে মনে ঘৃণা আর আক্রোশ পুষে যাকে স্বামীত্বে বরণ করতে বাধ্য হয়েছিল অরুন্ধতী, তিন বছরের অভ্যস্ত আসঙ্গে সে নিশ্চয়ই এমন কোন মায়ার শিকড় গাড়েনি তার জীবনে। হাঁ্যা, শুধু একজনকেই সে নিখাদ প্রীতিতে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল, তার নিজেরই রক্তশিশুকে।

এমন যে হবে তা জানতো অরুন্ধতী। বুকের মমতা যেদিন এই অবাঞ্ছিত সন্তানের সঙ্গে স্নেহ-প্রীতির বন্ধন ছিঁড়ে ফেলতে রাজি হয়নি, সব হারানোর

জীবনে এই সামান্য পাওয়ার উজ্জ্বল রামধনুটুকু যেদিন মুছে ফেলতে চায়নি ও, সেদিন থেকেই তা জানে অরুন্ধতী। কিন্তু, মা'র কুণ্ঠিত কণ্ঠস্বর কানে যেতেই যেন সমস্ত শরীর ওর ক্রোধে আক্রোশে জ্বলে উঠলো।

—যাক্, ভালোয় ভালোয় যে ফিরে পেয়েছেন দিদি, এই খুব। পড়শি প্রৌঢ়ার এই কথাটাই যেন জ্বালা ধরিয়ে দিলো ওর চোখে।

ছেলেকে কোলে নিয়ে কপাটের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো অরুন্ধতী। বললে, দৃঢ় ক্রোধের গলায়, ভালোয় ভালোয় আসিনি, ভালোয় ভালোয় যে আসিনি তার সাক্ষীও এনেছি।

ওমা, তেজ কেন মেয়ের এত, ভাবলে সবাই। পাঁচ বছর ধরে জাত-জন্ম খুইয়ে কোলে একটা ছেলে নিয়ে ফিরতে হ'ল যাকে, কোথায় সব সময় মুখ লুকিয়ে থাকবে, চোখাচোখি হলে মাথা হেঁট করবে, তা নয় স্পষ্টাস্পষ্টি জবাব! তবু সান্ত্বনা দেবার ভান ক'রে কেউ কেউ বললে, তোমার তো দোষ নয় মা, তুমি কি করবে।

আড়ালে অবশ্য ঠোঁট টিপে ইশারায় হাসাহাসি করলে ওরা। অর্থাৎ, এখন তো বলছে দাঙ্গায় হারিয়ে গিয়েছিল, দাঙ্গায় না কিসে ভগবান জানেন।

অরুন্ধতীর আর কি করবার আছে, বিছানায় লুটিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদা ছাড়া আর কি উপায় আছে ওর।

দু'চোখ ভিজিয়ে অরুণি শুধু কাঁদলো আর কাঁদলো। কোন্ ফাঁকে যে মা এসে তার পাশে বসেছেন, ব্যথায় কাঁপা হাত রেখেছেন ওর মাথায়, ধীরে ধীরে ওর চুলে পিঠে সান্ত্বনার সমবেদনার হাত বুলিয়ে দিতে শুরু করেছেন, তা ও টেরও পায়নি।

—ওঠ্ মা, ওঠ্, কাঁদিস্ না আর। বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেছে তাঁর, গলা ভারী হয়ে এসেছে। বলেছেন, লোকে কি ভাবলো না ভাবলো তাতে কি আসে যায় অরু?

ধড়মড় ক'রে উঠে বসেছে অরুন্ধতী। অশ্রুভেজা দু'চোখের স্পষ্ট দৃষ্টি ফেলেছে মা'র মুখের ওপর।

বলেছে, তবে, তুমি কেন লজ্জা পাও, তুমি কেন সত্যি কথা বলতে ভয় পাও?

—সাধে কি ভয় পাই মা ? দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়া জল মুছতে মুছতে মা বললেন, দাঙ্গায় তোকে, তোর বাবাকে, দু'জনকেই তো হারিয়েছিলাম মা। তোকে যে ফিরে পাবো ভাবিনি কোনদিন, ফিরে পাবার জন্তে যে কত মানৎ করেছিলাম !

অরুন্ধতীর গলার স্বরে অভিমান ফুটে উঠলো। বললে, ভুল করেছিলে। সেইজন্তেই হয়তো বিষ খেয়ে মরতে সাহস পাইনি। মরলে সব জ্বালা চুকে যেত।

—তোর বাবা যদি বেঁচে থাকতো ! দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মা ; বললেন, উনি থাকলে এত ভয় পেতাম না অরু। কিন্তু একা, এই পাড়াপড়শিদের মাঝে, সাহস পাই না একেবারে।

—তা হ'লে কি করতে হবে আমাকে বলে দাও। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো অরুন্ধতী।

স্পষ্ট ক'রেই বলতে পারলেন অরুন্ধতীর মা।

বললেন, এক কাজ করলে হয় না অরু? ছেলেটাকে অনাথ আশ্রমে রেখেও তো আমরা দেখাশোনা করতে পারি।

চমকে চোখ তুললে অরুণি।—কি বলছো মা ? তার চেয়ে বলো না এক আছাড় মেরে শেষ করে দিই ওকে, তোমরা শান্তিতে থাকতে পাবে।

কোন কথা বললেন না মা। আশ্চর্য ! অরু তো এমন ছিল না, এত অবাধ্য হ'ল ও কি ক'রে ? মতে মিলুক না মিলুক, এটুকুও কি বোঝে না যে ওর ভালোর জন্তেই তাঁর এত দুশ্চিন্তা। এত চোখ ঝাঁজানো কথা তাঁকে বলে কি ক'রে অরু। ভুলে যায় কেন যে যত কিছুই ঘটে থাকুক অরুন্ধতী ওঁরই মেয়ে।

কিন্তু সে কথা অরুণি বুঝবে কি করে।

কত কান্নাকাটি, কত অনুনয় বিনয় ক'রে ওর বাপের কাছ থেকে ছেলেটাকে ভিক্ষে চেয়ে এনেছে অরুন্ধতী, তা কি অরুর মা বুঝতে পারছেন। শুনলে হয়তো স্তম্ভিত হয়ে যাবেন, ভাববেন মেয়েটার বুঝি বা মাথার ঠিক ছিল না।

না সে-কথা ব'লে লাভ নেই। অরুন্ধতী শুধু বললে, না, মা, তা হয় না।

তবে ? এমনিভাবে পাড়াপড়শির ফিসফিসানি, আড়ালে আড়ালে হাসি-বিদ্রূপ ছড়ানো দেখেও সব সহ্য ক'রে যেতে হবে ? তিনি না হয় চোখ বুজে

থাকবেন, কিন্তু অরু কি সে-সব দেখতে পায় না, দেখেও কি মাথা উঁচু ক'রে চলতে পারবে ? ভেতরে ভেতরে শুধু শুকিয়ে যাবে দিনকে দিন। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, বিজু আর কলি বড়ো হচ্ছে, ওদের মনও কি এ গ্লানির স্পর্শ পাবে না ?

বললেন, তবে অন্য পাড়ায় উঠে যাই মা চল্।

—সব পাড়াই তো সমান। অরুন্ধতী হাসলে।—গায়ে ঘা দেখলে কোন্ পাড়ায় না মাছি বসে মা।

—সাধ-আহ্লাদ তো তোর শেষ হয়ে গেছে। থেমে থেমে—বেশ বোঝা গেল, ভয়ে ভয়ে—কথা শেষ করলেন মা, না হয় একটা থান কাপড়ই পরবি অরু।

অরুণি হেসে উঠলো খিলখিল ক'রে। কত দুঃখে যে মানুষ এমন পাগলের মত হাসতে পারে, মা বুঝলেন। আশ্চর্য। সধবাই হ'ল না যে কোনদিন, তাকে বিধবা হতে বললেন ! কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন—জানি না মা, যা ভাল বুঝিস্ কর।

ভালো বোঝবার আর কি আছে। ভালোর পথ কি আর প্রশস্ত আছে কোথাও ? শীর্ণ সড়ক ধরে আঁকাবাঁকা গলিতে আনাগোনা ছাড়া উপায় কৈ !

তাই মা'কেই একদিন বলতে হ'ল, যে ক'টা টাকা ছিল, আর আমার খান কয়েক গয়না যা দিদির কাছে গচ্ছিত ছিল, তা তো সব শেষ হয়ে এলো অরু। গায়ের গয়নাগুলো ছিল ব'লে তবু বিজু আর কলিকে বাঁচাতে পেরেছিলাম, তখন। কি করা যায় বলতো ?

—কি আর করবে। চাকরীর চেষ্টা করি একটা—উত্তর দিলে অরুন্ধতী।

সুতরাং চাকরীর চেষ্টাতেই ঘোরাফেরা শুরু হ'ল অরুন্ধতীর। খবরের কাগজ দেখে চিঠির পর চিঠি লেখা, আর নয়তো বেশ স্পষ্ট পোষাকে মুখে হাসির ঝিলিক ছড়িয়ে বিনয়ের অবতার সব কাঁচা বয়সের বড়ো সাহেবদের সঙ্গে দেখা করা।

এমনি কোন এক আপিসের সিঁড়ি ভেঙে নামতে নামতে, ব্যথায় বিরক্তিতে সমস্ত মন যখন ভরে আছে, পাশের লোকটার সঙ্গে একটা ধাক্কা লাগলেও যখন চোখ ফিরিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয় না, এমনি একটা মুহূর্তে অভাবনীয়ভাবে সুবিমলের সঙ্গে ওর আবার দেখা হয়ে যাবে, কে জানতো !

এতদিন বাদে আবার দেখা হ'ল।

অরুন্ধতীর সারা মনের কোণে পাপড়ি ফোটানো গুঞ্জন শোনা গেল।

সুবিমলদা!

সিঁড়ি ভেঙে নামতে নামতে সুবিমলের ওপর চোখ পড়তেই অরুন্ধতী থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছিল সুবিমল। ও আরো খানিকটা কাছে আসতেই নিঃসন্দেহ হ'ল অরুন্ধতী, সমস্ত মুখেচোখে খুসির ফুলঝুরি জ্বালিয়ে ব'লে উঠলো, সুবিমলদা তুমি!

চমকে চোখ তুলে অরুন্ধতীর দিকে তাকালে সুবিমল, কয়েকটা দ্রুত মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় দেখালো সুবিমলকে। তারপর ওর ম্লান বিষণ্ণ মুখ হঠাৎ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।—অরুণি? অরুন্ধতী?

আশেপাশে কে কোথায় আছে না আছে, কে কি ভাবতে পারে, কিছুই মনে পড়লো না ওর। সুবিমলের একটা হাত চেপে ধরে বললে, ওঃ, কতদিন বাদে দেখা বলো তো সুবিমলদা। তোমার সঙ্গে আবার যে দেখা হবে, ভাবতেই পারিনি। কোথায় আছো? এখানেই তো? মাধু, মাধুরী কোথায়? মাসীমারা ভালো আছেন? বিয়ে করেছো, করোনি তো? মা তোমাকে দেখলে কি খুশি যে হবে!

অনর্গল অগুনতি কথার তোড়ে সুবিমলের উত্তরটুকুও বোধ হয় ভেসে গেল। হাত ধরে তাকে টানতে টানতে নীচে নেমে গেল অরুন্ধতী।

—তারপর? কি খবর বলো সুবিমলদা, চুপ ক'রে আছো কেন? কে কোথায় আছেন, কেমন আছেন? কি করছো, চাকরী?

কথার যেন আর শেষ নেই। কত প্রশ্ন, কত কথা। সব জানবার এবং জানাবার কথাগুলো যেন একসঙ্গে ভিড় ক'রে আসে। কোন্‌টা আগে বলবে, কোন্‌টা পরে, কোন্ প্রশ্নের পরে কোন্ প্রশ্ন—সবকিছু যেন নিয়ম ভুল করছে। এতদিন বাদে মা-ভাই-বোনদের ফিরে পেয়ে যত না আনন্দ হয়েছিল, আজ হঠাৎ সুবিমলের দেখা পেয়ে যেন সত্যিই অরুন্ধতীর মনের পাতায় রোদ লাগলো, সবুজ রঙ ধরলো। আর এই উচ্ছলতার ঢেউয়ে নিজেকে সে এত বেশী ভাসিয়ে ফেললে যে, বহুক্ষণ পরে তবে ওর হুঁশ হ'ল সুবিমল জবাব দিচ্ছে না ওর কথার।

—আরে, বেশতো। কথা বলছো না যে। চোখের ভুরু কাঁপালে অরুণি। টুক্‌রা বিষণ্ণ হাসিতে ম্লান হ'ল সুবিমল।—কিন্তু আর বলবার আছে।

সুবিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কের ছায়া অনুভব করলে অরুন্ধতী। —কেন, কি হয়েছে সুবিমলদা, বলো না।

হাসলে সুবিমল।—কি আর হবে, কি হ'তেই বা বাকী আছে অরুণি।

অরুন্ধতী বুঝলো, কি যেন ব্যথার ছাপ সুবিমলের মুখে, কি যেন লুকোতে চাইছে সুবিমল। ওর মুখের অনর্গল প্রশ্নে আপনা থেকেই যতি পড়লো।

দুপুরের রোদ থেকে গা বাঁচিয়ে গির্জার ছায়ায় এসে দাঁড়ালো ওরা দু'জনে। রাস্তার সশঙ্কিত হর্নের হাত থেকে রেহাই পেতে। শুধু কি তাই? না। দীর্ঘ এক যুগ পরে দু'জনের আবার দেখা হ'লো। অভিশপ্ত আকস্মিকতার দেয়াল যে ঘনিষ্ঠতা, যে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের যুগ্মস্রোতে বাঁধ টেনেছিল, সে বাধা এতদিন পরে অপসৃত হ'ল। ঠিকানাহারা দুটো সমান্তরাল ঢেউ নতুন করে পরস্পরকে খুঁজে পেয়ে, যেন স্তব্ধ হয়ে রইল। কথার মতোই পথও খুঁজে পেল না।

ওরা শুধু অনুভব করলে পরস্পরকে ওরা হারিয়েছিল, পরস্পরকে আবার খুঁজে পেয়েছে। হাঁা, অনেক কথা জমে আছে মনের কোণে, অনেক অনেক কথার বরফ গড়িয়ে দিতে না পারলে যেন শান্তি নেই। কত কি শোনবার শোনাবার আগ্রহ দু'জনের! কোথায় যাবে, দাঁড়াবে, বসবে, ধীরে ধীরে একটি একটি ক'রে চীনে বাদাম ছাড়ানোর মত ক'রে কথা বলবে। জানবার এবং জানাবার কথাগুলো যেন সোডার বোতল খোলার মত একসঙ্গে উপছে আসতে চাইছে। তবু কে যেন কোন কথাই খুঁজে পাচ্ছে না। কোথায় যাবে, দাঁড়াবে, বসবে, বলবে কথা, কথা, কথা!

নিতান্ত আজেবাজে, অর্থহীন, অপ্রাসঙ্গিক দু'এক টুক্‌রা শব্দের সুর, দু'এক ঝলক হীরেজ্বলা হাসি।

কিন্তু এমন তপ্ত রোদ্দুরে গির্জার পাশে এমন ব্যস্তত্রস্ত জনচাঞ্চল্যের মাঝে মাঝে কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকা যায়।

অনেক কিছু আশা করেছিল অরুন্ধতী। ভেবেছিল, সেই আগের দিনের মত সুবিমলই পথ বাৎলে দেবে। কথার সুতো তুলে দেবে অরুণির হাতে। কিন্তু, না, সুবিমলও যেন দিশেহারা।

শেষে অরুন্ধতীকেই বলতে হ'ল, চলো সুবিমলদা, আমাদের ওখানে। মা

যে কি খুশি হবে তোমাকে দেখে। সত্যি, কে কোথায় যে ছিটকে গেল……
এত কষ্ট হয়। একটা চেনা লোকও দেখতে পাইনে।

বিষণ্ণ হাসি হাসলে সুবিমল। বললে, চেনা লোক হয়তো অনেইক আছে অরুণি, কিন্তু সবাই লুকিয়ে থাকতে চায়।

মুখ তুলে তাকালে অরুন্ধতী, কথাটা বোঝবার চেষ্টা করলে।

বললে, মুখ লুকোবার আর কি আছে বলো। কিন্তু ব'লে ফেলেই বুকের ভিতরটা যেন কেঁপে উঠলো। 'ওকে উদ্দেশ ক'রেই কি বলেছে নাকি সুবিমল? ওর কলঙ্কের কাহিনী কি সুবিমলেরও জানা?

সুবিমলের ভালবাসাই ছিল ওর অলঙ্কার। কলঙ্কের কালিতে সে প্রেম কি মলিন হয়ে গেছে? সব মন কি একই মানুষের?

ভয়ে কাঁপলো অরুন্ধতী। ওর জীবনের যে করুণ পরিচ্ছেদটা ও সদম্ভে আর পাঁচজনকে জানিয়ে মনের আক্রোশ মিটিয়েছিল, আজ সুবিমলের কাছে তা প্রকাশ হয়ে যাবার আতঙ্কে রুদ্ধশ্বাস কেন অরুন্ধতী!

তবু সুবিমলকে নিয়ে এলো ও, বললে, কলি যে কত বড়ো হয়ে গেছে দেখবে চলো। বিজু আর মা যে কি খুশি হবে!

সুবিমল এলো ওর সঙ্গে দুপুরের রোদে ঘামতে ঘামতে, ঠিক সেই পুরোনো দিনের মত, যখন একরাশ বই বুকে চেপে কলেজ থেকে ফিরতো অরুণি, রোদ্দুরের তাপে ডালিমের ছোঁয়া লাগতো ওর গালে, কপালে ফুটতো স্বেদ-সিক্ত পোখরাজের মালা। অপেক্ষা করতো একটা নির্জন গলির মোড়ে, সুবিমল আসতো, হাসতো, কথা বলতো, প্রথমে ইশারায়, তারপর স্পষ্ট ভাষায়, হাঁটতো পাশাপাশি দুপুরের নির্জন রোদ্দুরের পথে। ওরা দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে এলো, ট্রাম ধরলো, ট্রাম থেকে নামলো, পিচ গলা বড়ো রাস্তা ছেড়ে, ছোট্টগলির বাঁকে, রোদে ঝলসানো গ্যাসপোস্টের নীচের ডাস্টবিনের চারপাশে ছড়ানো জঞ্জাল লাফিয়ে লাফিয়ে, এপাশের চারতলা বাড়ী আর ওপাশে পাঁচতলা, তারই ফাঁকে সরু গলির চেয়ে আরো সরু মেটে কাদার পথটুকু পার হয়ে, সবচেয়ে কোণের, উপেক্ষিত, বে-বাতাস, নিরালা ঘরের কপাটের সামনে এসে দাঁড়ালো দু'জনে, কড়া নাড়লো অরুন্ধতী, মা এসে দরজা খুলে দিলেন। হঠাৎ বুঝি খুশী হয়ে উঠলেন তিনি, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মুখ ম্লান হ'ল।

স্যাঁৎসেতে নীচের তলার ছোট্ট অন্ধকার না বাতাস না-আলো এক-জানালার ঘরে এসে বসলো সুবিমল। ভাবলে, এ বাড়ীর ছাদে যখন বিকেলের ম্লান হলুদের আলো নামে, এ ঘরে তখন সন্ধ্যা। শহরে যখন সাইক্লোন, এ ঘরে, শুধুই শব্দ।

তবু। এ-ঘর অরুন্ধতীর ঘর।

মা'র দীর্ঘশ্বাস বললে, কোত্থেকে কোথায় এসেছি দেখে যাও। বললেন, তোমরা তো দেখেছো বাবা সেই বাড়ী বাগান, ষ্টেশনে নেমে ওঁর নাম বললে লোকে পৌঁছে দিয়ে যেত। কোথায় এসে উঠতে হয়েছে দেখে যাও!

সুবিমলের আকাশে তখন নতুন তারা ফুটছে। অরুণির চোখের তারায় ঘন গভীর আলো। কোত্থেকে কোথায় এসেছি দেখে যাও। সুবিমল ভাবলে, অনেক সমুদ্র পার হয়ে নতুন বন্দরে।

অন্ধকার ঘরের ছোট জানালাটার ধারে বসে, কাঁধের ওপর অরুণির ঠাণ্ডা নরম হাতের ছোঁয়ায়, সুবিমল জানালার বাইরে দৃষ্টি ফেললো। সে চোখ পাশের বাড়ীর দেয়ালে চাপা পড়েও অনেক অনেক দূর দিগন্তে পৌঁছে গেল।

অরুণির মন প্রশ্ন করলে, আমাদের সব স্বপ্ন কি মিথ্যে হয়ে গেছে!

সুবিমলের মনেও দ্বিধা।—যা হারিয়েছি তা কি ফিরবে না?

তারপর ওরা যখন পরস্পরকে একান্তে পেলো, সুবিমল অরুন্ধতীর মুখের দিকে মুগ্ধ কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকালে, কাছে টানলে অরুন্ধতীকে, ওর হাতের সুপুষ্ট আঙুলগুলোর সঙ্গে অরুণির নরম আঙুলগুলি আঙুরের লতার মত জড়িয়ে গেল।

ওরা দু'জনেই যেন অনেকগুলো আড়াল দেয়া ব্যর্থ বছরের পিছনে ফিরে এলো।

সুবিমল চোখ মেলে তাকালো অরুন্ধতীর দিকে, সমস্ত শরীর দিয়ে অনুভব করলে অরুণি। দু'জনেই যেন বলতে চাইলো, আমাদের মন যখন বদলায়নি, পৃথিবী বদলে গেলেও ক্ষতি নেই।

কিন্তু মনকে কতটুকুই বা বিশ্বাস! ভয়ে কাঁপলে অরুন্ধতী। সব জানার পরও কি সুবিমলের মুখে এমনি ভালবাসার জ্যোৎস্না থাকবে?

মা এসে দাঁড়ালেন। কচি ছেলের দুধে খাজনা বসিয়ে সুবিমলের জন্যে চা নিয়ে এলেন মা, কাঁসার গ্লাসে ক'রে। কথা শুরু করলেন সুবিমলের সঙ্গে।

কপাটের আড়ালে গিয়ে ইশারায় মা'কে ডাকলে অরুন্ধতী। মা'র হাত দুটো চেপে ধ'রে ফিসফিস ক'রে বললে, মা! ব'লো না। আর কিছু বলতে পারলো না অরুণি।

—দূর বোকা মেয়ে! হেসে ফিরে এলেন তিনি সুবিমলের কাছে।

দেখলেন না, ঝরঝর ক'রে চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো অরুন্ধতীর।

না, এ যেন নিজের কাছেই ছোট হয়ে যাওয়া। অরুন্ধতী ভাবলে, এ ভাবে সুবিমলের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকা, সে আরো লজ্জা। তার চেয়ে মা'কে বলবে (নিজে তো আর গুছিয়ে বলতে পারবে না) এবার যেদিন সুবিমলদা আসবে সব স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিও মা।

এমনি সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সমস্ত দুপুরের শ্রমক্লান্তি মুছে ফেলবার জন্যে জেটি, জাহাজ আর সারি সারি নৌকোর দিকে তাকিয়ে, গঙ্গার ঘোলা-জলের ধারে ঠাণ্ডা নরম ছায়ায় সুবিমলের পাশাপাশি বসে, বিকেলের বিষণ্ণ রোদ্দুর-মাখা অনেকগুলো মুগ্ধমুহূর্ত কাটিয়ে, অসহন একাকিত্বের ব্যর্থ পথ মাড়িয়ে বাড়ী ফিরলো অরুন্ধতী।

ফিরে এলো।

কিন্তু মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে সব কথা ভুলে গেল ও। একটা কপাটে ঠেস দিয়ে ভাবলেশহীন মুখে একটা খাম তুলে ধরলেন অরুন্ধতীর মা।

—কে খুললো চিঠি? আজকের ডাকে এসেছে? কার চিঠি বুঝতে না পেরে অরুন্ধতী প্রশ্ন করলো, কিন্তু উত্তর পাবার জন্যে অপেক্ষা করলো না। দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল আঁকাবাঁকা অক্ষরগুলোর ওপর। তারপর ধীরে ধীরে বেদনা-থম্-থম্ মুখে বিছানার ওপর এসে বসলো অরুন্ধতী, চিঠিটা মুঠোর মধ্যে চেপে বালিশের ভেতর মুখ গুঁজে দিলে।

সে চিঠি লিখেছে অরুন্ধতীকে।

আশ্চর্য!

অরুন্ধতীকে ফিরে চেয়েছে সে। লিখেছে, স্বেচ্ছায় অরুন্ধতী আবার ফিরে আসুক তার কাছে। ফিরে এলে কেউ বাধা দেবে না, আর ছিনিয়ে নিয়ে যাবে না কোন দারোগা-পুলিশ।

অদ্ভুত! যেন অরুণি ঐ ঘৃণিত দস্যুর বুকে নিজেকে সমর্পণ করবার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে আছে। যেন, অরুণির ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে কেড়ে আনা হয়েছে।

আশ্চর্য্য ! অরুন্ধতীকে চিঠি লিখেছে সে।

লিখেছে, অরুন্ধতী যদি ফিরতে না চায়, যদি তাদের প্রেম-প্রীতি বর্ষা রাতের ফানুসের মত চুপসে গিয়ে থাকে, তা হ'লে—তা হ'লে অন্ততঃ তার সন্তানকে যেন অরুন্ধতী ফিরে দেয়। আপন শিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে অরুন্ধতীকে ভুলে থাকবে সে।

আর অরুন্ধতী যদি ফিরে না আসতে চায়, তার সন্তানকে যদি ফিরে না দেয়, তা হ'লে অন্ততঃ একটি দিনের জন্যে, তার নিজেরই শিশুসন্তানকে যেন দেখতে দেয় অরুন্ধতী। কান্নার অনুনয়ে প্রার্থনা জানিয়েছে সে।

ধীরে ধীরে বিছানা থেকে উঠলো অরুণি, হাতের চিঠিটা ছিঁড়ে কুচিকুচি ক'রে ফেলে দিলো। একটা কুটিল আর হিংস্র হাসির রেশ ফুটে উঠল ওর ঠোঁট ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

সুবিমল আবার এলো আমন্ত্রণ জানাতে। অরুন্ধতী শুনলো, খুশিতে হাসলো, সায় দিলো, বেশবাস প্রসাধন কিছুটা, ছিমছাম শরীরে সুখীয়াল শিশির, হীরেজ্বলা হাসি, লজ্জা আর আনন্দে মেশা মুখ, ঠিক সেই পুরোনো দিনের মতই, হাল্কা পায়ে বেরিয়ে এলো অরুন্ধতী, সুবিমলের সঙ্গে। তারপর, অনেক স্মৃতির মত একটানা অনেকটা ট্রামের পথ পার হয়ে, শহর উত্তরের জরাজীর্ণ নির্জনতার ক্লান্ত বিষণ্ণ দারিদ্র্যের ঘরে এসে পৌছলো ওরা।

বুকে বাতাস পেলো অরুন্ধতী। চোখে রঙিন রামধনু।

টিনের ছাদ। বাঁশের চিক্ দিয়ে বানানো বেড়া। একটু দূরেই মোটর আর যন্ত্রপাতি মেরামতের একটা ক্ষুদে কারখানা। কুলি মিস্ত্রী ধরণের দু'চারজন এখানে সেখানে। অনেক দূরে চটকলের বাঁশী। লাল ধুলোর রাস্তা। ধুলো ওড়ায় দু'একখানা লরী, শব্দ ছড়ায়। তবু, এই মাটি বাতাস অরুন্ধতীর যেন কত আপন মনে হ'ল।

—অরুন্ধতী শোন। বাঁশের ফটক ঠেলতে ঠেলতে অরুণির মুখের দিকে তাকালে সুবিমল। সুবিমলের চোখ যেন বললো ফিসফিস ক'রে, শোনো অরুণি শোনো।

অরুন্ধতী তাকালো চোখ তুলে।—বলবে কিছু ?

একটা কথা তোমায় বলতে পারিনি অরুণি।

অরুণির সপ্রশ্ন ভুরুর রেখায় বিস্ময় ফুটে উঠলো।

সুবিমল ঠাণ্ডা ধীর স্বরে বললে, মাধু, মাধুরী নেই অরুণি।

—নেই ?

—আছে। কিন্তু, কিন্তু, না থাকলেই হয়তো ভালো ছিল।

মাধু, মাধুরী নেই ? জীবনের সেই এক ফোঁটা বয়স থেকে যাকে গভীরতম বন্ধু ব'লে চিনেছে, সেই অনেক আগ্রহের বন্ধু মাধুরী নেই ? রাস্তার বুকে ঘর কেটে দু'বন্ধুতে খেলা, খেলা—ঝগড়া—মিটমাট। আড়ি আর ভাবের বয়স থেকে প্রেমের ঘরে আড়িপাতার বয়স উত্তীর্ণ হওয়া। তারপর কত জ্যোৎস্নাস্নাত রাতের ছাদে দু'জনের উচ্চকিত হাসি, কথা, আনন্দ। ছাদের আলসে ধরে কত সময়ের স্রোত পার হয়েছে দু'জনে। মনের কপাট খুলে দিয়েছে, দুজন দুজনের কাছে। সেই মাধুরী নেই, না থাকলেই ভালো ছিল। কিন্তু কেন ? কি হয়েছে, মাধুরীর, কি ঘটেছে তার জীবনে ? প্রশ্ন করতে পারলো না অরুন্ধতী।

শুধু দেখলো, বুঝলো। কেউ একবারও মাধুরীর নাম মুখে আনলো না। মনে হ'ল, সুবিমলের সংসারের পাতা থেকে মাধুরীর নাম মুছে গেছে। স্মৃতির পাতা থেকেও হয়তো বা। আর তাই অদম্য এক উৎকণ্ঠায়, দুর্বোধ আগ্রহে প্রশ্নের ফেনা জমে উঠলো অরুন্ধতীর মনে। তবু ওর অনুসন্ধিৎসু মন চাপা পড়ে রইলো আর সকলের সঙ্গে দেখা হওয়া, কথা বলা, কুশল জানাজানির অপভ্রংশের নীচে।

তারপর সুবিমলের মা, ছোট ছোট ভাই বোন, দাদা বৌদি, সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, এনামেলের ভাঙ্গা পুরোনো পেয়ালায় চা খাওয়ার স্মৃতিতে নিজেদের দারিদ্র্যের কুণ্ঠা ভুলে, উত্তরের শহরতলীর ঘাস বাঁশ-বুনো ঝোপের মাঝ দিয়ে লাল ধুলোর রাস্তায় দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ যেন কথা হারালো দুজনেই—অরুন্ধতী আর সুবিমল।

মাধুরী নেই, মাধুরী না থাকলেই ভালো ছিলো।

কথাটা কানের কাছে আবার বেজে উঠলো।

মাধুরী আছে। কিন্তু কোথায়, কেমন ভাবে, কেন! ঠিক তেমনি আগের দিনের মতই কি এখনো হাসলে গালে টোল পড়ে মাধুরীর ? বিয়ে হয়েছে ? ছেলেমেয়ে ? মনে পড়লো, ছোট্ট ছেলে কাছে পেলে কেমন স্ফূর্তিতে নেচে উঠতো মাধুরী। আদরে আদরে ডুবিয়ে দিতো তাকে। কাজ ভুলে যেত,

নাচতো, হাসতো, শিশুর হাসি আর শিশুয়ালি দেখে। নিজের ছেলের জন্তেও কি মাধুরী তেমনি আদর আর যত্ন বুকে বাঁচিয়ে রেখেছে? কিন্তু সুবিমলের কণ্ঠস্বর, মা দাদা বৌদি—সকলের কথায় আশ্চর্য অনুপস্থিতি ঐ একটি নামের। সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া, ভুলতে চাওয়া কেন?

বাড়ী ফেরার পথে শেষ অবধি কৌতূহল চেপে রাখতে পারলো না অরুন্ধতী।

বললে, মাধু কোথায়, বললে না তো সুবিমলদা? তার সঙ্গে এত দেখা করতে ইচ্ছে হয়। সত্যি, কতদিন দেখিনি বলোতো!

সুবিমল মাথা নীচু করলো, মাথা তুললো, তাকালে এপাশে ওপাশে, যেন কথাটা শুনতেই পায়নি। তারপর ধীর ঠাণ্ডা গলায় আস্তে আস্তে বললে, মাধুর কথা জিজ্ঞেস ক'রো না অরুণি। ওর সঙ্গে দেখা করতে চেয়ো না।

অরুন্ধতী স্তম্ভিত হ'ল, বিস্মিত হ'ল। ওর চোখ প্রশ্ন করলো, কেন সুবিমলদা, কি হয়েছে মাধুর?

লজ্জায় আর আত্মগ্লানিতে যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেল সুবিমল। ফিসফিস করে বললে, মাধু—মাধু খারাপ হয়ে গেছে অরুণি।

চমকে চোখ তুললো অরুন্ধতী। চোখ নামালো। বিস্ময়ে হতাশায় সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলো ওর, চোখ ঠেলে জল এলো। মাধু, মাধুরী নেই। মাধুরী না থাকলেই ভাল ছিল। মাধুরী, ওর সেই মনের অন্তরঙ্গ কোণ মলিন হয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে।

মাধু খারাপ হয়ে গেছে অরুণি।

ছোট্ট কয়েকটা কথা, কিন্তু এমন ধারালো বর্শার আঘাত অরুন্ধতীকে আর কখনো সহ্য করতে হয়নি।

সুবিমল আবার আস্তে আস্তে বললে, আমরা তখন ট্রেনে। হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠলো সেই রাতে, ট্রেন থেমে গেল, মাধুকে হারাতে হ'ল আমাদের।

শিউরে উঠলো অরুন্ধতী। নিজেরই জীবনের একটা পরিচ্ছেদ মনে পড়ার জন্তে নয়, সুবিমলের মনের হদিস পাওয়ায়। ভুল বুঝেছে ও। ঢেউয়ের গায়ে মিনার তুলতে চেয়েছে। এই কি মাধুরীর খারাপ হয়ে যাওয়া? হিংস্র বিদ্বেষে সশব্দে হেসে উঠতে ইচ্ছে হ'ল ওর। নিজে গোপন গ্লানির ইতিহাস প্রকাশ না ক'রে ভালই করেছে অরুন্ধতী।

বিদ্রূপে হাসলো না অরুন্ধতী, ফেটে পড়লো না ক্রোধে আক্রোশে। শুধু নিশ্চুপ ব্যথায় সহানুভূতিতে না-ভাবার গভীরে ডুবে গেল অরুন্ধতী।

সুবিমল তেমনি ফিসফিস করেই বললে, তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চাই না অরুণি। মাধুকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর খারাপ হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না ওর।

আশায় আশায় মুখ তুলে তাকালে অরুন্ধতী।

বিষণ্ণ দেখালো সুবিমলকে।—আমরাই খোঁজখবর করলাম ওর জন্যে। দিনের পর দিন, কত মাসের পর মাস কেটে গেল, খুঁজে পেলাম না ওকে। বেঁচে আছে এ কথাও যখন ভুলতে বসেছি, সেই সময় হঠাৎ একদিন খবর এলো, আর তারপরই পুলিশের হেফাজতে ফিরে এলো মাধুরী।

অরুন্ধতী উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলে, তারপর?

ম্লান হাসলে সুবিমল, অরুন্ধতীর একখানা হাত চেপে ধরলো হঠাৎ। বললে, ভুল বুঝো না অরুণি, দোষ আমার নয়।

থেমে থেমে বললে, মাধুর পরেও তো তিনটি বোন রয়েছে, মা বললে, মাধুর জন্যে শেষে কি ওদেরও বিয়ে দিতে পারবো না, এতগুলো জীবন মিছিমিছি নষ্ট হয়ে যাবে, দুর্নাম রটবে সমস্ত পরিবারের?

—তাই মাধুকে তাড়িয়ে দিলে, এই তো? বিদ্রূপ বেজে উঠলো অরুন্ধতীর গলায়।

—না। লজ্জায় মাথা নীচু ক'রে সুবিমল বললে, সবকিছু গোপন রেখে বিয়ে ঠিক ক'রে ফেলা হ'ল মাধুরীর। কিন্তু মাধু বেঁকে বসলো। বললে, সারাজীবন ধরে নিজের কলঙ্ক ও লুকিয়ে রাখতে পারবে না।

—আর তাই বিয়েটা হ'ল না? আরো তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বর অরুন্ধতীর প্রশ্নে।

সুবিমল বুঝলো না। সহজভাবেই বললে, মা আর দাদা মত দিলে বিয়েটা হয়ে গেলে মাধু জেদ ছেড়ে দেবে, আর জানতে পেরেও ওর স্বামী হয়তো সবকিছু ক্ষমা করবে। কিন্তু হিসেবে ভুল হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের পরই সব প্রকাশ ক'রে ফেললে মাধু, আর মাধুকে বা আমাদের কোন কিছু না জানিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল ওর স্বামী।

অরুন্ধতীর চোখের কোণ দুটো জ্বালা ক'রে উঠলো, কঠোর তীব্র ভাষায় কিছু একটা বলে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল ওর। তবু চুপ ক'রে রইলো। কোন

কথা বললে না, শুধু শুনলো সুবিমলের কথাগুলো. নিঃশব্দ পায়ে ঘাস বাঁশ বুনো ঝোপের ধার দিয়ে লাল ধুলোর রাস্তায় পাশাপাশি হেঁটে যেতে যেতে মাধুরীর জন্যে সমস্ত মন ওর ব্যথায় কাতর হয়ে উঠলো। সেই অপরূপ লাবণ্য-উদ্ভাসিত মুখের সারল্য মনে পড়ে গেল। ভাবলে সে মুখের দুর্ভাগ্য এত অসহন কি করে হ'ল।

সুবিমল আবার ফিসফিস ক'রে বললে, সকলের কাছ থেকেই বকুনি খেলো মাধু। মা বললে, মাধুর যা খুশি সে করুক, কিন্তু অন্য মেয়েগুলোর তো বিয়ে দিতে হবে। সম্মান সম্ভ্রম নিয়ে বাঁচতে হবে তো সবাইকে। শুধু মাধুর জন্যে সমস্ত পরিবারটা তো আর ধ্বংস হতে পারে না। দাদা বললে, তার চেয়ে মাধু বেঁচে না থাকলেই ভালো ছিল, ফিরে না এলেই পারতো।

—স্বেচ্ছায় তো ও ফিরে আসেনি সুবিমলদা। অদৃষ্ট মেনে নিয়েই ও হয়তো ভালো থাকতো, তোমরাই তো হৈ-চৈ করে উঠেছিলে দেশশুদ্ধ। ঘরের ছাদ সারানোর আগেই বৃষ্টির জন্যে হাহুতাশ করেছিলে।

সুবিমল চুপ করে রইলো, অনেকখানি হেঁটে এসে বাস ষ্ট্যাণ্ডের কাছে থামলো। তারপর শান্ত গলায় বললে, সেই অভিমানেই হয়তো মাধুও চলে গেল একদিন।

—আর কোন খোঁজ পাওনি? উৎকণ্ঠা ফুটে উঠলো অরুন্ধতীর স্বরে।

লজ্জায় মাথা তুলতে পারলো না সুবিমল। ফিসফিস ক'রে বললে, পেয়েছি। আবার খারাপ হয়ে গেছে মাধুরী।

মনের অন্দরে বিদ্রূপের হাসি হাসলে অরুন্ধতী। তুমিই না বলেছিলে সুবিমলদা মানুষের মনটাই সবচেয়ে বড়ো। তবু তোমরা, মাধুর স্বামী—সকলেই ভয় পেলে কেন?

—মন তো শরীরের বশ, অরুণি। শরীর অশুচি হলে···কথা শেষ করতে পারলো না সুবিমল।

আর অরুন্ধতীর মনে হ'ল, নীতিবাগীশ কোন গ্রাম্য টুলো পণ্ডিতের কথা শুনছে সে। বয়েস, পোষাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা—যত পৃথক্‌ই হোক্, সব মানুষের বুঝি-বা একই মন।

না। তার চেয়ে এমনি অসহ্য আত্মদাহই জীবনের সম্বল হয়ে থাক্। সুবিমলের কাছে আর ফিরে যাবে না অরুন্ধতী, ফিরে যেতে পারবে না।

কত কত দিনের পর দিন আর রাত নিঘুম চিন্তার জালে, অশান্ত জ্বালায় কাটিয়ে দিলো অরুন্ধতী। আর তারই ফাঁকে মাঝে মাঝে বুকে এসে বিঁধছে এক নতুন কাঁটা। বিষাক্ত জ্বালায় জ্বলছে পুড়ছে অরুন্ধতী, অনুপায় আক্রোশে।

তার চিঠি!

অনুনয় উপরোধের চিঠি। শুধু ঘৃণা আর ব্যর্থ ক্রোধ পুষে রেখেছে ও যার বিরুদ্ধে, যে ওর জীবনের চোখে টেনে দিয়েছে কলঙ্কের কাজল, তার চিঠি। তার প্রার্থনা। কাঁটার মত এসে বিঁধছে অরুন্ধতীর বুকে।

অরুন্ধতী ফিরে এসো। ফিরে দাও আমার শিশুকে। অন্তত একটি-বারের জন্যে তাকে দেখতে দাও অরুন্ধতী।

অনুনয়! শুধু আক্রোশ আর বিদ্রূপ জমা হয়ে আছে অরুন্ধতীর মনে।

এর চেয়ে কত আন্তরিক উপরোধ ঢেলে দিয়েছিল অরুন্ধতী, সেই নৃশংসতার পায়ে। কত কান্নার সজল চোখ মেলে মন ভেজাতে চেয়েছিল ও, পাশবিকতার পা জড়িয়ে ধরে ভেবেছিল সে পায়ের শিরা-উপশিরায় বুঝিবা মানবতার রক্ত আছে।

অরুন্ধতীর এত অশ্রুর স্পর্শে সহানুভূতির পাষাণ একটুও নরম হয়নি সেদিন।

সেইসব দিনের কথা মনে পড়লে আতঙ্কে হিম হয়ে যায় সারা শরীর। দিনের পর দিন অত্যাচার, আঘাত, অপমান। অরুন্ধতীর সমস্ত জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে, সম্মান-সম্ভ্রমের দেয়ালে ফাটল ধরিয়েছে সে, মুখ তুলে কথা বলার সব স্বাধিকার কেড়ে নিয়েছে। তারপরও জানিয়েছে সে অনুনয়ের প্রার্থনা। একটার পর একটা।

তারই চিঠি!

মনে মনে আবার হাসলো অরুন্ধতী, হাত বাড়িয়ে নিলো চিঠিটা, কি যেন ভাবলো, পড়লো।

সেই একই চিঠি নয়, একই প্রার্থনা নয়।

চিঠি নয়। আসবে সে, রাত্রির অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে সে আসবে। একটি মাত্র অনুরোধের হাত বাড়িয়ে সে আসবে। নিজের জন্যে এই গোপনতা নয়। অরুন্ধতীর সম্মান আহত হবে এই ভয়ে রাত্রির অন্ধকারে আসবে সে।

অরুন্ধতীকে ফিরে চায় না সে। জানে, অরুন্ধতীকে ফিরে পাবে না।

তার আপন সন্তানকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় না সে। জানে, ফিরে পাবে না তাকে অরুন্ধতীর কাছ থেকে।

শুধু একটি বারের জন্য, একটি মুহূর্তের জন্য গলির মোড়ের গ্যাসপোস্টের তলে এসে দাঁড়াবে সে, অপেক্ষা করবে। শুধু একবার দৃষ্টির দু'বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরবে তার আপন শিশুসন্তানকে।

আর কিছু নয়, আর কোন উপরোধ প্রার্থনা নয়।

তবু উপহাসে কৌতুকে বিষাক্ত হাসি ফুটলো অরুন্ধতীর মুখে।

না, ক্ষমা করতে পারবে না অরুন্ধতী। সুবিমলকেও নয়।

একজন শুধুই ঘৃণা পেয়েছে অরুন্ধতীর, আরেকজন অরুন্ধতীকেই ঘৃণা করে।

সব ইতিহাস জানা হ'লে অরুন্ধতীকেও দূরে সরিয়ে দেবে সুবিমল। ভালবাসার, শ্রদ্ধার, সম্মানের আসন ফিরে পাবে না ও।

তবু শুধুই পথ খুঁজলো। চিন্তার জালে চোখ হারালো। চঞ্চলতায় মন।

তারপর সেই নির্দিষ্ট দিনের সূর্য আকাশে উঠলো, দিগন্তে ডুবলো, আর অশ্রুতে ভাসলো অরুণির মন। কি আশ্চর্য! সমস্ত দিন, সমস্ত সন্ধ্যা অরুণি শুধু ভাবলো আর ভাবলো।

এতদিনের ব্যর্থ আক্রোশ মেটাবার দিন এসেছে। জীবনের চরম শত্রুকে হাতের মুঠোয় পেয়েছে অরুণি।

প্রতিশোধ নেবার তীব্র অধীরতায় রক্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে যেন। যে শুধু ঘৃণাই পেয়েছে আর যে শুধু ঘৃণাই দিয়েছে অরুন্ধতীকে, আজ এই চরম মুহূর্তে তাদের দু'জনকেই যেন হিংস্র আনন্দে ছিঁড়ে ফেলতে চায় ও।

জাফরানী দিন বিকেলে নামলো, লাল বিকেল শিশুসন্ধ্যায়। না-বাতাস না-আলো এক-জানালার নিরালা ঘরের কোণে অন্ধকার গাঢ় হ'ল, পথ নির্জন। শহরের রাস্তায় রাস্তায় ইলেট্রিকের আলোয় আরো আঁধার ঘন হ'ল, ঘন ধোঁয়া, ধোঁয়া নীল বাঁকা গলির বাঁকে। তারপর লোক এলো, মই কাঁধে। বাতিজ্বালা লোক।

আলো নয়। ছায়া দিলো গ্যাসবাতি। রহস্যের, আতঙ্কের।

রাত্রি বাড়লো। নির্জনতম পথ

একটি একটি ক'রে চারিপাশের জানালার আলো নিভলো, শব্দ থামলো, ঘুম নামলো চাঁদ ঢাকা পাঁচ-তলা বাড়ীর কার্নিশে কার্নিশে।

দশটা বাজার ঘণ্টা ভেসে এলো দূরের ট্রাম ডিপো থেকে। অধৈর্য হয়ে উঠলো অরুন্ধতী। অপেক্ষার সীমান্তে এসে পৌঁছিলো ও এতক্ষণে।

সমস্ত বাড়ীর ঘুম-নিঝুম মেঝের ওপর পা টিপে টিপে সন্ত্রস্ত চোখে চতুর্দিকে তাকালো অরুন্ধতী। তারপর ঘন গভীর কালো শাড়ীর আড়ালে সমস্ত শরীর ঢেকে ফেললে অরুন্ধতীকে, আর কালো ঘোমটার আড়ালে গ্যাসের ফিকে জ্যোৎস্নায় অরুন্ধতীর সুন্দর মুখ আরো সুন্দর দেখালো। আরো বিষণ্ন, করুণ। তবু ঐ তীরতীক্ষ্ণ চোখের কোণে কোথায় যেন বিষনিঃশ্বাস।

আপন শিশুকে কোলের কাপড়ে আড়ালে নিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলো অরুন্ধতী। মেটে কাদায় অন্ধকার শীর্ণতম পথটুকু পার হয়ে গলির মোড়ে গ্যাসপোস্টের দিকে পা বাড়ালো অরুণি।

দূরের দৃষ্টিতেও তাকে চিনতে পারলো অরুন্ধতী। দেখালো, অধৈর্য হয়ে পায়চারী করছে সে। আশায়, হতাশায়।

অরুন্ধতীর কালো ঘোমটার তন্বী শরীরে কি চিহ্ন ছিল কে জানে, মুহূর্তে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তার মুখ, এগিয়ে এলো সে।

—চলো।

স্পষ্ট গলায় বললে অরুন্ধতী, আর বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে চোখ তুললো সে। কি বলছে অরুন্ধতী? সে শুধু একটি মুহূর্তের দর্শন চায়, তার আপন সন্তানের। আর কিছু নয়।

—চলো।

আবার বললে অরুন্ধতী।

—ফিরে যাবে? ফিরে যাবে অরুন্ধতী? অবিশ্বাসের ম্লান মুখ হঠাৎ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে বললে, জানতাম। জানতাম অরুন্ধতী তুমি ফিরে আসবে।

ফিরে আসবে! বিদ্রূপের হাসি দুললো অরুন্ধতীর চোখে।

রুমাবাঈ

যখনকার কথা বলছি আনারবাগ তখন নেটিভ স্টেট ইনামপুরের রাজধানী। নতুন বা পুরোনো কোন মানচিত্রেই অবশ্য এ নাম দুটো খুঁজে পাবেন না। কারণ, নিখাদ সত্যি ঘটনাটা বলবার মত দুঃসাহস আমার নেই এবং বলা হয়তো উচিতও নয়। ডাল্টনবাজারের ইতিহাস আমি যেভাবে মহুয়ামিলনের নামে চালিয়েছি, রুমাবাঈকে নিয়ে গল্প লিখতে হলেও সেই পন্থাই অনুসরণ করতে পারতাম। কিন্তু যে স্টেটেরই নাম দিই না কেন, কে বলতে পারে সেখানেই রুমাবাঈ ধরনের অন্য কোন চরিত্র আছে কিনা। গল্পকে নিছক গল্প হিসেবে স্বীকার করেন না, এমন পাঠকের অভাব নেই এবং সে কারণেই সম্প্রতি আমি একটু বিপদেও পড়েছিলাম।

রুমাবাঈ অবশ্য আজ আর বেঁচে নেই, থাকলেও এ গল্প পড়ে হয়তো খুশিই হতেন। কিন্তু উষ্মা প্রকাশ পেতো রাজা প্রতাপকিঙ্কর চন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের ব্যবহারে।

আশ্চর্য এই যে, আনারবাগের পঞ্চান্ন বছরের আধ-পাগলা রাজা বাহাদুরের কাছে রুমাবাঈয়ের চরিত্রের কোন দিক্‌টাই অজ্ঞাত ছিল না।

রাজা বাহাদুরের খাস আস্তাবলের হেড্ সহিসের সুন্দরী স্ত্রী জাহানারার সঙ্গে প্রতাপকিঙ্কর চন্দ্রনারায়ণ সিংহের নাম জড়িয়ে গোপনে হাসাহাসি করতো অনেকে এবং পরপর নানা ঘটনার সূত্র জুড়ে কিউ ই ডি লিখে প্রমাণ ক'রে দিতো যে রুমাবাঈ আসলে রাজা বাহাদুরের মেয়ে।

হলেও আপত্তি করবার কিছু ছিল না। রূপে এবং বলা বাহুল্য যৌবনে, রুমাবাঈ ছিল একেবারে ষোল আনা রাজকন্যে।

তখন পর্যন্ত আমি রুমাবাঈ নামটাই শুনেছি, স্বচক্ষে তাঁর দর্শন পাবার সৌভাগ্য হয়নি। কারণ, আমি ইনামপুর স্টেটের প্রজা ছিলাম

না। আনারবাগের নতুন সুগার ফ্যাক্টরীতে চাকরী নিয়ে গিয়েছিলাম সেখানে।

এখন অবশ্য আমি ইনামপুর স্টেটের পাইক-বরকন্দাজদের নাগালের ব.ইরে এবং রাজা বাহাদুরের প্রতাপও এখন শুধু তাঁর নামেই, তাঁর স্বেচ্ছাচারের আইন এখন ঠুঁটো হয়ে গেছে। তবু তাঁকে ভয় করার একটি কারণ আছে। যে হেভি কেমিক্যাল ফ্যাক্টরীটায় আমি এখন চাকরী করছি, তার রেসিডেণ্ট ডিরেক্টর কালে সাহেব প্রতাপাকঙ্করের পিয়ারের দোস্ত এবং রাজা বাহাদুরের সুপারিশেই আমি এ চাকরীটা পেয়েছি।

সুপারিশ পেয়েছিলাম, কিন্তু আমি লোকটা যে কে তা রাজা বাহাদুর স্বচক্ষে কোনদিন দেখেননি। স্বচক্ষে তিনি কিছুই দেখতেন না। ফর্সা গোলগাল চেহারা, বাকীটা ভোজপুরী দারোয়ানের মত। আর এই শরীরের ওপর একরাশ মখমলের রাজবেশ, মখমলের ওপর সোনালী জরি, লাল-নীল নানা দুর্মূল্য পাথর চুমকির মত বসানো। সিংহাসনে বসে মাথার মুকুট পরে একটা ছবি তুলিয়েছিলেন প্রতাপকিঙ্কর, আর সেই ছবিটাই তিন রঙে ছাপা ক্যালেণ্ডার হয়ে আমাদের সকলের মেসে-কোয়ার্টারে শোভা পেতো।

তাই রাজা বাহাদুরকে আমরা সকলেই চিনতাম। চিনতাম না রুমাবাঈকে।

সেদিন শুক্ল তিথির জ্যোছনার রাতে শরীরে মলমল জড়িয়ে কোথায় রোমান্সের পক্ষীরাজে উড়ে বেড়াবার কথা, তা নয় হঠাৎ কেমন যেন বেতো বুড়োর মত থিটখিটে হয়ে উঠেছিলাম। হয়তো চাকরীর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়েই।

একশো পঁচিশ টাকা মাইনেতে বহাল হয়ে গিয়েছিলাম আনারবাগের সুগার ফ্যাক্টরীতে, যে কারখানার স্বত্বাধিকারী ছিলেন স্বয়ং রাজা প্রতাপ-কিঙ্কর চন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর। আর যেহেতু স্টেটের দেওয়ানজী মিষ্টার রায় এবং চিনির কারখানার মাদ্রাজী ম্যানেজার মিস্টার কৃষ্ণস্বামী, এ দুজনের একজনেরও অশ্রিত লোক ছিলাম না, সেইজন্যেই হয়তো স্থায়ীভাবেই আমাকে রাতের শীফটে ফেলে দিয়েছিলেন য়্যাসিস্টেণ্ট প্রোডাকশন ম্যানেজার করিম সাহেব।

ডাকে পাওয়া নিয়োগপত্রটি নিয়ে যেদিন প্রথম হাজির হলাম করিম সাহেবের কামরায়, সেদিনই টের পেয়েছিলাম, কপালে কি দুর্ভোগ আছে।

ফাইল ঘেঁটে আমার দরখাস্তটার ওপর চোখ বুলিয়ে কি যেন খুঁজে পেলেন না করিম সাহেব। অন্তত তাঁর মুখচোখ দেখে তাই মনে হয়েছিল।

আর সেই জন্যেই বোধ হয় ভুরু কুঁচকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, কার লোক তুমি?

প্রশ্নটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু বুঝতে না পারলে যে শুনতে পাইনি এমন একটা মুখভাব ক'রে বেগ ইওর পার্ডেন বলতে হয় সে বিদ্যে রপ্ত ছিল।

করিম সাহেব উল্টে চটেই গেলেন। —কানে কম শোনো নাকি? কার লোক তাই জিজ্ঞেস করছি?

বললাম, আজ্ঞে তা তো জানি না, কাগজে কেমিস্ট চাই বিজ্ঞাপন দেখে এপ্লাই করেছিলাম।

—আই সী! অস্ফুটে বললেন করিম সাহেব, তারপর আমার নিয়োগ পত্রের এক কোণে লাল কালিতে লিখলেন, রেকমেনডেড ফর নাইট শীফট। লিখে নীচে নাম সই ক'রে বললেন, ঐ যে গলাবন্ধ কালো কোট পরে কেরাণী-বাবু বসে আছেন, ওর কাছে যাও। গিয়েছিলাম, এবং যাওয়ার পর সেই যে নাইট শীফটের ইনচার্জের সঙ্গে তিনি আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন তারপর থেকে একদিনের জন্যেও দিনের শীফটে বদলি হতে পাইনি।

ফলে সারারাত ডিউটি দিয়ে এসে সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমোতাম, আনার-বাগের লোকজনের সঙ্গে ভালো ক'রে আলাপ করার সুযোগও পাইনি। তাই বোধহয় সেদিন ঘুরন্ত পিনিয়নটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন একটা অসহ্য বিতৃষ্ণা জমা হচ্ছিল মনের মধ্যে।

কারখানাটা ছিল বেশ খানিকটা উঁচু টিলার গায়ে। কিছুটা সমতল জমি কারখানার এলাকা পার হয়ে, তারপর ঢালু নেমে গেছে নীচের কুলিকামিনদের বস্তী অবধি।

একটা মোটা জলের পাইপ অতিকায় একটা অজগরের মত নেমে এসেছে ওপরের রিজারভয়ের থেকে, এসে ঢুকেছে কারখানার ভেতর। কুলিমজুরের হট্টগোল এড়িয়ে বাইরে এসে বসেছিলাম পাইপটার ওপর। বসে বসে দেখছিলাম আনারবাগের রূপ।

পূবের সীমান্তে যতদূর চোখ যায় শুধুই হিমাচলের আঁকাবাঁকা তরঙ্গ। যেন সুদীর্ঘ একখানি শ্যামল শাড়ী বিছানো আছে আকাশের গায়ে।

জ্যোৎস্নার রোশনাই লেগে তুষারশুভ্র হিমচূড়ার রেখাটি যেন ফিকে রুপালী রঙের পাড়। কোন দৈত্যের কঙ্কালের মত চারপায়া উঁচু রিজার্ভয়ারের পিছনে ধোঁয়াটে আকাশের গায়ে বড়ো এক টিপ চাঁদ।

আনমনা উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম সেদিকে।

মেশিন চলছে। কেরিয়ার থেকে আখের রাশি ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে খিদে মেটাচ্ছে রসলোভী যন্ত্রের।

অবিরত শোঁ শোঁ শব্দ, আর পিনিয়নের মূর্ছনা। পিনিয়নের দাঁতে দুটি বিশাল হিংস্র চাকার মধ্যে রাশি রাশি আখ মাড়াই হচ্ছে, একদিকে জমা হচ্ছে ছোবড়ার রাশ, আর অন্যদিকে একটি উন্মুক্ত চোঙা বেয়ে ঢলে পড়ছে আখের রস।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম একটি ছায়াশরীর এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে।

এতখানি দূর থেকে স্পষ্ট দেখা গেল না, কিন্তু লোকটি যেন এক আঁজলা রস তুলে পান করবার জন্যে ঝুঁকে পড়লো।

কুলিমজুরদের সঙ্গে কাজ ক'রে ক'রে মেজাজটাও হয়ে উঠেছিল রুক্ষ।

চিৎকার ক'রে উঠলাম।—এই বেকুফ!

ছায়াশরীর সোজা হয়ে দাঁড়ালো, শব্দ লক্ষ্য ক'রে তাকালো আমার দিকে।

এগিয়ে যেতে যেতে রুক্ষস্বরেই বললাম। বললাম, কি করছিলে?

কিন্তু ততক্ষণে আমি আরো কাছে পৌছে গেছি। চাঁদের আলোয় তার শরীরের রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পুরুষ নয়।

বব্ করা নরম চুল, উলের আঁট ব্লাউজ, ট্রাউজারের কোমরে হাত দিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

—বলছিলে কিছু? পরিষ্কার উর্দুতে নারীকণ্ঠের শান্ত প্রশ্ন শুনলাম।

গলার স্বর আপনা থেকেই নরম হ'ল, বললাম, কি করছিলেন আপনি? এ রসে হাত দেওয়া বে-আইনী।

মেয়েটি হঠাৎ খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো।—বে-আইনী? ব'লে চুপ করলে মেয়েটি।—আমি কে জানো হে ছোকরা? আমি রুমাবাঈ।

রুমাবাঈ! সমস্ত শরীরে যেন শিহরণ খেলে গেল। আর পরমুহূর্তেই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলাম। অস্বস্তি, না ভয়?

আপনা থেকেই গলার স্বর শান্ত হ'ল। যন্ত্রচালিতের মত তিনবার কুর্নিশ

ক'রে তিন পা পিছিয়ে এলাম, সন্ধ্যের সময় একদিন দেওয়ানজী মিস্টার রায় কারখানা দেখতে আসায় ম্যানেজার মিস্টার কৃষ্ণস্বামী যেভাবে কুর্ণিশ করেছিলেন ঠিক সেইভাবে।

তারপর মাথা তুলে দেখলাম রুমাবাঈ যেন কৌতুকের হাসি হাসছেন। হাসতে হাসতেই বললেন, নতুন এসেছো, না? কোথাকার লোক তুমি?

—বেঙ্গল। ছোট্ট একটি কথা, তাও যেন জিভে জড়িয়ে গেল।

—তাই বলো। কিন্তু একটু ভদ্র হতে চেষ্টা করো। কারণ এটা বাংলা দেশ নয়, আর রুমাবাঈয়ের ইচ্ছাটাই এখানে আইন।

এত চেষ্টা ক'রেও হাত দুটোকে পরস্পর থেকে পৃথক রাখতে পারলাম না, হাত কচলাতে কচলাতে বললাম, এ রস তো খেতে পারবেন না, এতে ধূলো-বালি-ময়লা মিশে আছে, একটু অপেক্ষা করেন তো ভালো টাট্‌কা রস এনে দিচ্ছি। ব'লে উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই ছুটে গেলাম।

'মিনিট দুই পরে কাঁচের গ্লাসে টাট্‌কা এবং ছাঁকা পরিষ্কার রস নিয়ে যখন ফিরে এলাম তখন রুমাবাঈ উধাও। এদিক ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ দেখতে পেলাম প্যালেসের দিকে এঁকেবেঁকে যে রাস্তাটা এগিয়ে গেছে সেই রাস্তার ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে একখানা মোটরবাইক। আর মোটরবাইকের আরোহীর দেহরেখাটা যেন রুমাবাঈয়ের ব'লেই মনে হ'ল।

সে রাত্রিতে আর কাজে মন বসলো না। একটি নাম কেবলই ঘুরে বেড়ালো কানের চারপাশে, বিভীষিকার মত। রুমাবাঈ! রুমাবাঈ!

কারখানার প্রতিটি কর্মীর কাছে কতবার শুনেছি এ নাম। কত গোপন রসিকতা, কত অবোধ্য রহস্য। ভয় আর ভালোবাসা। বিদ্যুতের মত যার আকর্ষণ। বিদ্যুতের মতই যার চোখে মৃত্যুর পরোয়ানা।

সমস্ত শরীরে জরাতুর উত্তাপ আর মনে দুশ্চিন্তার পাথর নিয়ে বাসায় ফিরেছিলাম সে রাত্রে।

তারপর দুপুরে এক সময় ডাক পড়েছিল করিম সাহেবের কাছে।

ভয়ে ভয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

করিম সাহেব একরাশ কাগজপত্রের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে বসেছিলেন, মাথা না তুলেই বললেন, নাইট শীফটে তুমি ছাড়া আর কোন বাঙালী আছে?

বললাম, না স্যার।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন করিম সাহেব, মাথা তুললেন না। তারপর এক সময় হঠাৎ বললেন, তোমার সাহস তো কম নয়, ম্যানেজারের কাছে কম্‌প্লেন করেছো আমার নামে?

—কমপ্লেন করেছি? বিস্মিত হলাম।

—করোনি? নাইট শীফটে রেখেছি ব'লে দরখাস্ত করোনি তুমি?

—না স্যার।

—হুঁ। আচ্ছা যাও, কাল থেকে ডে শীফটে কাজ করবে। করিম সাহেব এবারেও মাথা না তুলেই বললেন।

চলে আসছিলাম, হঠাৎ বললেন, মিস্টার কৃষ্ণস্বামীর সঙ্গে দেখা করো।

দুর্বোধ্য বিস্ময় আর আশঙ্কার অনুরণন বাজলো মনের কোণে। তবু ভয়ে ভয়ে গিয়ে দেখা করতে হ'ল ম্যানেজার মিস্টার কৃষ্ণস্বামীর সঙ্গে।

নমস্কার ক'রে বললাম, ডেকেছেন আমাকে?

অনেকক্ষণ ধরে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে মিস্টার কৃষ্ণস্বামী বললেন, দেওয়ানজী মিস্টার রায় তোমার রিলেটিভ? আগে বলোনি কেন?

বললাম, আজ্ঞে না, দেওয়ানজী আমাকে চেনেনও না।

কৃষ্ণস্বামী হাসলেন।—চেনেন না? অথচ তোমাকে ডে সীফটে বদলি করবার জন্যে ফোন করেছিলেন আমাকে?

বললাম, বিশ্বাস করুন—

—রাতের শীফটে তো তুমিই একমাত্র বাঙালী?

বললাম, হ্যাঁ স্যার।

কৃষ্ণস্বামী কি যেন চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, আচ্ছা যাও। কাল থেকে ডে শীফটে।

চলে এলাম। কিন্তু যে খবর শুনে খুশি হয়ে ফিরে আসার কথা, সে খবর শুনেই কেমন যেন আতঙ্ক বোধ করলাম।

দেওয়ানজী মিষ্টার রায়। তিনি বলেছেন আমাকে দিনের শীফটে বদলি করতে? কেন? আমাকে চিনলেনই বা কি করে? ভাবলাম, কে জানে, আমি যে বাঙালী সে খবর হয়তো তাঁর কানে গেছে। তাই তিনি রাত্রির নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে চেয়েছেন আমাকে। কিংবা, কে জানে,

দেওয়ানজীর সুপারিশে চাকরি পাওয়া বীরেন বক্সীই হয়তো সহকর্মীর জন্যে এ কাজটুকু ক'রে দিয়েছে।

দিনের পাল্লায় আমি এবং বীরেন বক্সী ছাড়াও আরো পাঁচজন বাঙালী ছিল। তাই কাজের সঙ্গে আড্ডা আর গল্পগুজব যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে গিয়েছিল। কৃষ্ণস্বামী এবং করিম সাহেব সাধারণত দপ্তরেই বসে থাকতেন, দু'এক মিনিটের জন্যে যদি-বা আসতেন তো বাতাসের আগে সাবধানবাণী পৌঁছে যেত।

সেদিনও অমনি কানে কানে খবর এলো, রুমাবাঈ আসছে, রুমাবাঈ আসছে। সঙ্গে দেওয়ানজী।

মিনিট কয়েক পরে কৃষ্ণস্বামী এবং করিম সাহেবের সশ্রদ্ধ পথপ্রদর্শনকে তাচ্ছিল্যভরে উপেক্ষা করতে করতে রুমাবাঈ এগিয়ে এলেন। মেশিন নয়, মানুষগুলোর দিকেই যেন তাঁর চোখ। কিন্তু ছিমছাম চেহারার দেওয়ানজীর দৃষ্টি কাজের দিকে। আমরা দেখলাম শুধু রুমাবাঈকে।

সেদিন রাত্রিতে রুমাবাঈকে দেখেছিলাম, আর এ রূপ যেন ভিন্নজনের। দামী রেশমের শালোয়ার আর পাঞ্জাবীতে তাজা রক্তের বর্ণাভা, সলমা চুমকির ঝলমলানি আর গোলাপী ওড়নার প্রান্ত লুটিয়ে আছে যৌবনোদ্দীপ্ত বুকের ওপর। চোখের নীচে সূক্ষ্ম সুর্মার লোভানি। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দৃষ্টি, সুডৌল হাত যেন গোলাপের পাপড়ি দিয়ে মাজা, যৌবনপুষ্ট জঙ্ঘায় অস্থির চঞ্চলতা।

ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়লো, কাছে এগিয়ে এলেন রুমাবাঈ। কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই বিজন আচার্যের দিকে দৃষ্টি ফিরলো তাঁর।

—এই ছোক্‌রা, শোনো এদিকে।

বিজন এগিয়ে এলো, কুর্ণিশ ক'রে সাম্‌নে দাঁড়ালো।

রুমাবাঈ জিজ্ঞেস করলেন, কি নাম তোমার?

নাম বললে বিজন।

—আচারিয়া? আচ্ছা যাও, কাজ করগে যাও। ব'লে অন্য একটা মেশিনের দিকে এগিয়ে গেলেন রুমাবাঈ।

আমাদের ফ্যাক্টরীর তৈরী এক মুঠো চিনি দেখালেন মিস্টার কৃষ্ণস্বামী

সন্তুষ্ট হ'লেন না রুমাবাঈ।—এ তো স্রেফ ধুলো, এর চেয়ে বড়ো দানা হয় না?

জাভা চিনির নমুনাটা কারখানায় তৈরী ব'লে দেখিয়ে দিলেন কৃষ্ণস্বামী। বললেন, দুরকমই হয়।

দেখে সন্তুষ্ট হলেন রুমাবাঈ। ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেলেন।

আর ওরা সদলবলে চলে যাওয়ার পর ঠাট্টা শুরু করলাম আমরা বিজনকে নিয়ে।

আমার চেয়ে বয়সে ছোটই ছিল বিজন। কিন্তু শুধু সেই জন্যেই নয়, বিজনের ওপর আমাদের সকলেরই কেমন একটা দুর্বলতা ছিল অন্য কারণে। রুমাবাঈকে দোষ দেওয়া যায় না, যে কোন নারীমন বিজন আচার্যের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। সুন্দর সুপুরুষ চেহারা, আর সে চেহারার চুলে এবং চোখে কি এক অনুপম মাধুর্য। অথচ পোশাক-পরিচ্ছদ নোংরা, সব সময়েই মেশিনের তেল আর কালি লেগে আছে। তার কারণ, বিজনের চাকরিটা ছিল অতি নগণ্য। মেশিন পরিষ্কার করা, দাঁতে দাঁতে মোবিল ঢালা; মাইনে ছিল পঞ্চান্ন টাকা, সে বাজারেও তা লোভনীয় ছিল ব'লেই বাংলাদেশ ছেড়ে এত দূরে আসতে হয়েছিল তাকে।

কিন্তু আমাদের প্রাদেশিক আভিজাত্যে ঘা লাগতো তার জন্যে। বিজনের চেয়েও তো কম কোয়ালিফায়েড লোক ছিল ইনামপুর স্টেটের সুগার ফ্যাক্টরীতে। অথচ বিজনের বেলাতেই কিনা এমন চাকরি?

সেই বিজনকে ডেকে কথা বলেছেন রুমাবাঈ, সুতরাং রসিকতা করতে ছাড়বো কেন আমরা।

বললাম, দেখিস ভাই, সেদিন রাত্তিরে খুব ফাঁড়া কেটে গেছে, বিপদে পড়লে বাঁচাস্ বিজন।

শুধু বক্সী হেসে বললে, সাবধান বিজন, রুমাবাঈ কিন্তু একটি আসল 'কেন ক্রাশার'। আখ হয়ে ঢুকলে—

নিষ্কাশিত-রস ছিবড়ের স্তূপটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে হাসলো বক্সী।

রহমান, আয়ার, মিশ্র কেউই ঠাট্টা করতে কসুর করলে না।

কিন্তু ঠাট্টা যে সত্যি হতে পারে তা আমরা কেউ কল্পনাও করিনি।

আনারবাগের একটা দিকের নাম ছিল বাঙালীটোলা। স্টেটের বাঙালী

চাকরেরা সকলেই থাকতেন সেই পাড়ায়, একমাত্র দেওয়ানজী মিস্টার রায় ছাড়া। বাঙালীটোলার কালী মন্দিরের পাশেই ছিল একটা মেস, আর সেই মেসে আমরা জন পঁচিশেক লোক থাকতাম। সুগার ফ্যাক্টরীর সাতজন, হেভি কেমিক্যালস্-এর কয়েকজন, আর্ট স্কুলের একজন শিক্ষক, মেয়েদের কলেজের একজন কেরানী এবং আরো যেন কে কে। বৃহস্পতিবারটা ছিল আমাদের ছুটির দিন।

সকালের চা আর ডাকযোগে আসা বাসি খবরের কাগজ নিয়ে বারান্দায় বসে আছি আমরা, হঠাৎ লাল রঙের টু-সীটারখানা দেখা দিল।

শোঁ ক'রে বাঁক নিয়ে একেবারে আমাদের বারান্দার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল গাড়িটা।

দেখলাম, স্টিয়ারিং ধরে বসে আছেন রুমাবাঈ।

মেসের দরোয়ানটা ছুটে গেল, ফিরে এলো তটস্থ হয়ে। আচারিয়া সাহেবকে ডাকছেন রুমাবাঈ।

হাঁটুতে হাঁটু ঠেকলো বিজনের, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে দাঁড়াল বিজন। হাত বাড়িয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিলেন রুমাবাঈ, কি যেন বললেন বিজনকে, আর আমাদের চোখের সাম্‌নেই বিজনকে পাশে বসিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলেন।

হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম সকলে। এমন ঘটনা যেন গল্পেই ঘটে। গল্পেও নয়। শুধু দুর্নামী রটনায়।

বক্সী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, লাজ-লজ্জার বালাই নেই। একেবারে—

জানি না, বক্‌সী হয়তো এখনো আনারবাগেই আছে, সুতরাং তার শেষ কথাটা না বলাই ভালো। কিন্তু মানুষ কথায় আর কতটুক প্রকাশ করতে পারে, মনের পুঞ্জীভূত ঘৃণাকে ভাষা দেবার মত বাহন হয়তো এখনো আবিষ্কৃত হয়নি।

রুমাবাঈ! যে নামটা এতদিন ছিল বিস্ময়ের, আশঙ্কার, আতঙ্কের কণ্ঠে উচ্চারণ করবার মত, সেই নাম যেন ঘৃণার মন্ত্র হয়ে দাঁড়াল। আর দুঃখ হ'ল বিজনের জন্যে। ওর কি দোষ, কি করতে পারে ও বেচারী, এই অনাচারের রাজত্বে।

কিন্তু আমরা নিজেরাও বুঝতে পারিনি, কখন থেকে বিজনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাকেও ঘৃণা করতে শুরু করেছিলাম।

প্রথম দিন বিজন ফিরে আসার পর জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোথায় গিয়েছিলি, কেন ডেকে নিয়ে গেল ?

শুনে হেসেছিল বিজন।—তোমরা যা ভাবছো তেমন কিছু নয়।

আমরা কিন্তু বিশ্বাস করিনি। বিশ্বাস না করারই কথা। দিনে দিনে পরিবর্তন লক্ষ্য করতাম বিজনের। পোশাক-পরিচ্ছদে সব সময়েই ফিটফাট হয়ে থাকতো বিজন। কোনদিন নিজেই আসতেন রুমাবাঈ, কোনদিন বা গাড়ি পাঠিয়ে দিতেন।

প্যালেসের দর্জি শেখ সাহেব আসতো কোন কোনদিন, আর আমরা যেভাবে কুর্ণিশ করেছিলাম রুমাবাঈকে, সেইভাবেই বিজন আচার্যকে কুর্ণিশ করতো দর্জিটা।

দেখে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতাম আমরা। কিন্তু বিজনের সামনে হাসিঠাট্টা করতে সাহস হ'ত না। বুঝতে পারিনি, আপনা থেকেই বিজনকে ভয় পেতে শুরু করেছি আমরা।

ইতিমধ্যে ধাপে ধাপে চাকরিতে উন্নতি হচ্ছিল বিজনের। মেশিন-ইন-চার্জ থেকে সুপারভাইজার, সুপারভাইজার থেকে প্রোডাকশন ম্যানেজার। যিনি প্রোডাকশন ম্যানেজার ছিলেন তাঁকে বদলি ক'রে দেওয়া হ'ল হেভি কেমিক্যালসের ফ্যাক্টরীতে। আর আমি হলাম ব্লিচিং ডিপার্টমেণ্টের কেমিস্ট-ইন-চার্জ। মাইনে এক পয়সা বাড়লো না, বাড়লো কাজ।

সেইজন্যেই যত রাগ গিয়ে পড়লো বিজনের ওপর। যার জন্যে সহানুভূতি দেখাতাম, তাকেই ঈর্ষা করতে শুরু করলাম।

সহানুভূতি থেকে ঘৃণা, ঘৃণা থেকে ভয়, ভয় থেকে ঈর্ষা। আশ্চর্য মানুষের মন! কথাবার্তা একরকম বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। প্রয়োজনের সময়ে যে দুচার কথা বলতাম তাও মেপেজুখে। যে অন্তরঙ্গতার সূত্রে বাঁধা ছিলাম আমরা তা থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে গেল বিজন!

মেস ছেড়ে অন্য একটা বাড়িতে উঠে গেল ও, আর আমরা একজোট হলাম ওর বিরুদ্ধে। আলোচনা করতাম, ষড়যন্ত্র করতাম কিভাবে জব্দ করা যায় বিজনকে।

নাইট শীফটের সকলেই ছিল আমার পরিচিত। তারা জানতো, প্রোডাকশন ম্যানেজার হওয়ার যোগ্যতা নেই বিজনের। তার না ছিল শিক্ষা, না অভিজ্ঞতা। তবু কেন সে সকলের মাথার উপর চড়ে বসে থাকবে!

এ. পি. এম. ছিলেন ধুরন্ধর লোক। বিজনের ওপর তিনিও ছিলেন অসন্তুষ্ট। তাই আমাদের কথা শুনে অসহযোগ শুরু করলেন তিনি। বিজনের আদেশটুকুই মানতেন, নিজের বিদ্যেবুদ্ধির সাজেশন দিয়ে এতটুকু উপকার করতেন না। ফলে, প্রোডাকশন কমতে লাগলো। এ ছাড়া, আজ এ মেসিন বন্ধ, কাল ওটা খারাপ। আর কেমিস্টের কারসাজিতে যা তৈরী হতে শুরু হ'ল, কাশীর চিনিও তার তুলনায় উঁচু দরের।

দ্রুত উন্নতির তালে তালে চলতে পারলো না বিজন, মেজাজ হয়ে উঠলো রুক্ষ।

বিজনের ব্যবহারে কুলিমজুরদের মধ্যেও অসন্তোষের বীজ ছড়িয়ে পড়লো।

তবু টনক নড়লো না ম্যানেজারের। খোদ রুমাবাঈ যার সহায়, তাকে আমরা অপদস্থ করবো কি ক'রে।

ওদের সন্ধ্যাভিসার জ্বালা ধরিয়ে দিতো আমাদের মনে। কোনদিন দেখতাম গুলাব মহলের ঝাউবাগানে পাশাপাশি হেঁটে চলেছে বিজন আর রুমাবাঈ। কোনদিন বা পাহাড়ী ঝর্ণাটার ধারে জলে ভাসা পাথরে বসে গল্পগুজবে মত্ত।

আশ্চর্য চোখ ঝলসানো রূপ ছিল রুমাবাঈয়ের। আসমানী স্বচ্ছ শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে জ্বলতো তার যৌবনের উদ্দামতা, স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য।

একদিন দেখেছিলাম, সঙ্কীর্ণ গিরিপথ বেয়ে চলেছে একজোড়া আরবী ঘোড়া। ফুটফুটে সাদা ঘোড়াটার পিঠে দৃপ্ত ভঙ্গীতে বসে আছেন রুমাবাঈ।

আরেকদিন দূর থেকে দেখেছিলাম, সুইমিং কস্টিউম পরে স্নান করছেন রুমাবাঈ, ঝর্ণার জলে নেমে। সে কি হাসাহাসি, পরস্পরের গায়ে জল ছিটিয়ে সাঁতার কেটে দূরে পালানো।

স্নান সেরে একটি শ্বেতাভ পাথরের ওপর এসে দাঁড়ালো রুমাবাঈ। নারীর শরীর নয়, যেন জ্বলন্ত কামনা।

ধরা পড়ার ভয়ে দূর থেকে দেখেই পালিয়ে এসেছিলাম সেদিন।

কিন্তু বিজন পালিয়ে আসতে পারেনি।

ও হয়তো সত্যিই ভালবেসে ফেলেছিল রুমাবাঈকে। তা না হ'লে কি মোতিকুমারীকে বিয়ে করতে রাজী হ'তো ও ?

খবরটা এনেছিল বক্সী। —শুনেছো ব্যাপার ? বিজনের সঙ্গে মোতি-কুমারীর বিয়ে দিতে চায় রুমাবাঈ।

—মোতিকুমারী কে ? প্রশ্ন করেছিলাম।

বক্সী বিস্মিত হয়েছিল। —সে কি ? চেনো না তাকে ? স্টেটের মেডিক্যাল অফিসারের মেয়ে। রোগা আর কুৎসিত চেহারার মেয়েটা, যে মেয়েদের ইস্কুলে টিচারী করে। দু'বেলা তো যায় এখান দিয়েই।

চিনতে পেরেছিলাম। যৌবন বয়সেও যে নারীদেহ কত কুৎসিত হতে পারে মোতিকুমারীকে না দেখলে বোঝা যাবে না।

তাই বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, বিয়ে দিয়ে রুমাবাঈয়ের লাভ ?

বক্সী হেসেছিল, উত্তর দেয়নি।

তারপর বলেছিল, রাজকন্যার খেয়াল। তোমাকে যে রাতের শীফ্‌ট থেকে দিনে বদলি করিয়েছিল, কেন ? লাভ ছিল ওর ?

—সে কি ? রুমাবাঈ বদলি করিয়েছিল ? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

বক্সী শুনে হাসলো।—জানতে না ?

বললাম, কোন্ খবরটাই বা আমরা জানি। কিন্তু মোতিকুমারীর সঙ্গে যদি বিজনের বিয়ে হয় তা হ'লে খুশি হবো। কিংবা ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে যদি খোঁড়া হয়।

বক্সীও হেসেছিল। —হবে, হবে। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

যে কোন ভাবে বিজনের ক্ষতি করতে পারলে, বিজনকে অসুখী দেখতে পেলে তখন সত্যিই খুশি হয়ে উঠতাম। আমাদের সকলের কাছেই ও তখন চক্ষুশূল।

কিন্তু ভেতরে ভেতরে বিজনও যে রুমাবাঈয়ের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছে, জানতাম না।

সন্দেহ হ'ল যেদিন শুনলাম চিনির কারখানা থেকে হেভি কেমিক্যালসে বদলি হয়েছে বিজন।

বক্সী বললে, শুনেছো খবর ? পাঁচশো থেকে তিনশো টাকায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছে বিজনকে।

—সত্যি ?

আজ স্বীকার করতে লজ্জা হয়, কিন্তু সেদিন সত্যিই খুশি হয়েছিলাম। আমাদের সমস্ত পরাজয়, সব গ্লানি যেন মুছে গেল এই একটি খবরে।

ঠিক যেমনভাবে ধাপে ধাপে উন্নতির শিখরে উঠেছিল, তেমনি ধাপে ধাপে নামতে শুরু করলো ও। আর আমরা সকলেই তার দুর্দশা দেখে আনন্দে আত্মহারা হ'লাম। কারণটা অজানা রইলো না। রাজা প্রতাপকিঙ্কর চন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর তখন তিনখানা ডাকোটা বিমান কিনেছেন, আনারবাগ থেকে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্যে। আর এই ডাকোটা বিমানের পাইলট হয়ে যে তিনজন নবাগতের আগমন হ'ল তাদের একজন হ'লো নিহাল। পাঞ্জাবী হিন্দু অর্থাৎ দাড়িগোঁফ চাঁচা সুশ্রী চেহারা, যেমন সুশ্রী তেমনি স্মার্ট।

এই নিহালের সঙ্গে প্রায়ই আকাশ-বিহারে যেতে শুরু করলেন রুমাবাঈ। শুনতে পেতাম রুমাবাঈ নিজেও নাকি প্লেন চালানো শিখছেন।

অসম্ভব মনে হ'ত না, কারণ রুমাবাঈয়ের পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব ছিল না। ধুলিয়াবাবার আশ্রমের পাশ দিয়ে যে শীর্ণ খাড়াই পথটা পাহাড়ের গা বেয়ে একেবেঁকে টুমুরিয়ার দিকে উঠে গেছে সেই দুর্গম পথ বেয়ে যেদিন ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে দেখেছিলাম রুমাবাঈকে, তারপর থেকে ধারণা হয়েছিল, রুমাবাঈয়ের পক্ষে সবই সম্ভব।

বৈমানিক নিহালের সঙ্গে মাঝে মাঝে রুমাবাঈকে দেখতে পেতাম আংরেজবাজারে। কখনো-বা ইম্পিরিয়েল ক্লাবের টেনিস লনে।

দেখে খুশি হ'তাম আমরা, খুসি হতাম এই ভেবে যে, নিহাল বিজন নয়।

বিজন যেদিন হেভি কেমিক্যাল্স্ থেকে সুগার ফ্যাক্টরীতে ফিরে এলো, কৌতুকের হাসি হেসে বললাম, দেখছিস্ বক্সী, বাছাধনের মুখটা একেবারে চুণ !

বক্সী হেসেছিল।—দুদিনের জন্যে খুব নবাবী ক'রে নিলো যা হোক্। ভাগ্যিস্ দেওয়ানজীর কানে তুলেছিলাম।

—তার মানে ?

বক্সী হেসে বলেছিল, রুমাবাঈ যদি কাউকে ভয় করে তো সে এক দেওয়ানজী।

যে বিজনকে দেখলে একদিন সকলেই ভয় পেতো সে কোনকালেই হাতী ছিল না, দ্বিতীয়ত কাদায় পড়েছে। সুতরাং অন্ত সকলেই আড়ালে টীকা-টিপ্পনি কাটতে শুরু করলো। প্রথম প্রথম আড়ালে, তারপর কিছুটা শুনিয়ে শুনিয়েই।

একদিন আবার মেসবাড়িতেই ফিরে এলো বিজন। আগের মতই মেলা-মেশা করবার চেষ্টা করলে। কিন্তু স্বাভাবিক হতে পারলাম না আমরা। কোথায় যেন চিড় খেয়েছে, জোড়া লাগানো গেল না।

ওকে এড়িয়ে চলতাম। ঘৃণা নয়, কেমন যেন কৌতুক বোধ করতাম ওর কথা উঠলেই। ওর পরাজয় যেন আমাদেরই জয়তিলক।

তবু মনের মধ্যে ঔৎসুক্য গুমরে মরছিল, তাই চেপে রাখতে পারলাম না। একদিন বিজনকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন এমন হ'ল বলতো বিজন?

বিষণ্ণ হাসি হাসলে ও। বললে, কি জানি। খানিক চুপ ক'রে থেকে বললে, হয়তো মোতিকুমারীর জন্যে।

বিস্ময়ে মুখ তুলে তাকালাম ওর দিকে।

দুঃখের হাসি হেসে বিজন বললে, মানুষ যে কখন কাকে ঈর্ষা করে!

ঈর্ষা! যেন নিজের মনেরই প্রতিধ্বনি শুনলাম। সত্যিই তো, এই বিজনকেই একদিন ঈর্ষা করতে শুরু করেছিলাম আমরা। ঘৃণা করতাম? হ্যাঁ, ঘৃণা—কিন্তু সে তো ঐ ঈর্ষা থেকেই।

বিজন চুপ ক'রে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললে, সেদিন এক চায়ের আসরে ডেকেছিল রুমা। অনেকে এসেছিল, তার সঙ্গে মেয়েদের ইস্কুলের মাস্টারনী মোতিকুমারী। দেখেছো তুমি তাকে?

—দেখেছি।

বিজন বললে, ওর চেয়ে কুৎসিত কোন মেয়ে চোখে পড়েছে তোমার? পড়েনি। তাই হয়তো কেউই ওর সঙ্গে কথা বলছিলো না। মেয়েপুরুষ আরো অনেকে ছিল সেদিন, সকলেই গল্পগুজব করছিল, হৈ-হুল্লোড়ে মেতে-ছিল। আর মোতিকুমারী উপেক্ষিত হয়ে এক কোণে বসেছিল চুপ ক'রে। অথচ রুমাবাঈয়ের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করার সাহস ছিল না তার। দেখে মায়া হ'ল, গিয়ে ওর পাশের চেয়ারে বসলাম।

উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলাম, তারপর?

—তারপর মাঝেমাঝে দেখা হ'লে দু'একটা কথা বলতাম, হাসি ফুটতো ওর মুখে। ওর হাসি দেখে আমিও যেন খুশি হতাম। সে-কথা বলতাম রুমাকে। শুনে রুমা একদিন বললে, তুমি ওকে বিয়ে করো···কি জবাব দেবো এ-কথার। বললাম, অসম্ভব। শুনে যে চোখে তাকালো রুমা, সে-চোখ আমি কোনদিন দেখিনি।

—তারপর? যেন কোন রোমহর্ষক কাহিনী শুনছি এমনি উৎকণ্ঠায় প্রশ্ন করলাম।

বিজন বললে, তারপর? তারপর তো তোমরা জানো।

বললাম, রাজি হলি না কেন? রুমাবাঈয়ের খেয়াল, রাজি হলে হয়তো ভুলেও যেতো।

বিষণ্ণ দেখালো বিজনকে। বললে, রাজি হয়েছিলাম। ভয়ে নয়, সত্যিই ভালবেসে ফেলেছিলাম মোতিকুমারীকে। রুমার নির্যাতন যত বাড়তে লাগল ততই যেন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলাম মোতিকুমারীর সঙ্গে, তারপর যেদিন বললাম, মোতিকুমারীকে আমি বিয়ে করছি, সেদিন—এই দেখো—

ব'লে জামাটা তুলে বিজন ওর পিঠটা দেখালে।

শিউরে উঠলাম। ফর্সা পিঠের ওপর গোটাকয়েক কালসিটে দাগ, যেন ক্রোধান্ধ কেউ চাবুকের পর চাবুক বসিয়েছে সেখানে।

বিস্মিত হয়ে তাকালাম, সে কি? কেন?

বিজন হাসলে।—আমি জানতাম ঈর্ষায় জ্বলছে রুমা, কিন্তু স্পষ্ট ক'রে বলতে পারছে না। অথচ ওর সন্দেহ যে সত্যি তার প্রমাণ না পেলে যেন শান্তি নেই ওর। কিন্তু তোমাকে বলছি আমি, বিশ্বাস করো, রুমার চোখের সাম্‌নেই আমি মোতিকুমারীকে বিয়ে করবো। শেষের কথাগুলো এত দৃঢ়তার সঙ্গে বললে ও, যেন নিজের মনকেই বলছে।

বিয়ে সত্যিই হ'ল একদিন। কিন্তু রুমাবাঈয়ের চোখের সাম্‌নে নয়। বাঙালীটোলার কালীবাড়ীতে যখন বিজন আর মোতিকুমারী মন্ত্র উচ্চারণ করছে সেই সময় নিহালের সঙ্গে রুমাবাঈ আকাশবিহারে উঠছেন। আর তার কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল সেই ডাকোটা বিমানখানায় আগুন লেগেছে। মুহূর্তের মধ্যে রাত্রির আকাশে বিদ্যুৎ জ্বালিয়ে প্রচণ্ড শব্দে মাটিতে পড়লো প্লেনটা।

ভিড় ছুটলো আনারবাগের ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ডটার দিকে। তখনও আগুনের শিখা জ্বলে জ্বলে উঠছে কালো আকাশের গায়ে। গুজব ফিরে এলো কিছুক্ষণের মধ্যেই।

কিন্তু, না, পরের দিন সকালেই খবর পাওয়া গেল। মারা যাননি রুমা-বাঈ, বাঁচবেন কিনা তাও সন্দেহ। সমস্ত শরীর নাকি ঝলসে গেছে তাঁর, যদি-বা প্রাণে বেঁচে যান তবু চিনতে পারবে না কেউ। হয়তো অন্ধ হয়ে যাবেন, হয়তো পঙ্গু হয়ে কাটাতে হবে সারা জীবন, আগুনে পোড়া কুৎসিত মাংসপিণ্ডের মত।

আমরা সবাই, যারা এতদিন ঘৃণা ক'রে এসেছি, দুর্ণাম রটিয়েছি রুমা-বাঈয়ের, কেমন যেন ব্যথা অনুভব করলাম।

আনারবাগ শহরের উজ্জ্বলতম তারা যেন হঠাৎ নিঃশেষ হয়ে মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে, যে তারার আলো আমাদের মনেও রোমাঞ্চ জাগাতো, যে তারার আলোয় ধাঁধাঁ লাগতো আমাদের কল্পনাবিলাসী চোখে।

দিনকয়েক পরে বিজনকে কাছে ডেকে ফিস্ ফিস্ ক'রে প্রশ্ন করলাম, শুনেছিস?

—শুনেছি।

বললাম, একবার দেখা ক'রে আয় বিজন, মৃত্যুর আগে এইটুকু সান্ত্বনা তাকে দিয়ে আয়। এই দুর্ঘটনাই প্রমাণ করলো বিজন, রুমা বাঈ তোকে ভালবাসতো।

অবিশ্বাসের হাসি হাসলে ও।—বলছো যখন যাবো। তুমিও চলো।

প্যালেসের এক প্রান্তে সুব্যাপ্ত একটি ফুলের বাগানের মাঝখানে রাজা প্রতাপকিঙ্কর চন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের দানে গড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রুমাবাঈকে।

অনুমতি নিয়ে দেখা করতে গেলাম আমি আর বিজন।

একটি ফর্সা ধবধবে রোগশয্যায় সাদা চাদরের মত ম্লান হয়ে পড়েছিল রুমা-বাঈয়ের অর্ধ অচেতন শরীর। ওষুধের একটা তীব্র দুর্গন্ধ চারিদিকের হাওয়ায়। আর রুমাবাঈয়ের সারা শরীর ব্যাণ্ডেজে মোড়া। সমস্ত মুখ ব্যাণ্ডেজে ঢাকা।

ধীরে ধীরে টুলটায় বসলো বিজন। আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে রুমাকে স্পর্শ করতে গিয়ে হঠাৎ হাতটা ফিরিয়ে নিলো।

ডাক্‌লে, রুমা!

ঠিক্‌ বোঝা গেল না, কি যেন অস্পষ্ট শব্দ বেরিয়ে এলো রুমাবাঈয়ের মুখ থেকে। একটু বোধ হয় নড়লো ওর শরীরটা।

নার্স ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বিজনের নাম বললে।

রুমাবাঈ ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, ও আসেনি?

--কে? নার্স চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলে। —কে রুমাবাঈ?

—রায়, মিস্টার রায়। উত্তর এলো ধীর স্বরে।

—দেওয়ানজী? উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন ক'রে বসলাম।—খবর দেবো, ডেকে পাঠাবো রুমাবাঈ?

মরণোন্মুখ একটি নারীর যে কোন শেষ ইচ্ছাকে তৃপ্ত করলে যেন আমিও তখন তৃপ্ত হই।

দীর্ঘশ্বাসের মত ব্যথার কণ্ঠে রুমাবাঈ বললেন, না, না, আমি জানি সে আসবে না।

—আসবে না? বিস্ময়ের স্বরে নার্স প্রতিপ্রশ্ন করলে।

হয়তো ব্যাণ্ডেজের বাঁধনে চাপা পড়ে গেল রুমাবাঈয়ের বিষণ্ণ ম্লান হাসি। —পাথর, পাথর সে, মানুষ নয়। এত ঈর্ষার আগুন জ্বালাতে চেয়েছি বিজন, তবু চোখ ফেরায়নি সে। হেরে গেলাম, হেরে গেলাম আমি।

কোন কথা বললাম না আমরা। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে উঠে এলাম। আর রুমাবাঈয়ের সমস্ত দুর্নাম, সমস্ত হঠকারিতা আর দীপ্ত যৌবনের উদ্দামতায় ঢাকা পড়েছিল যে অতৃপ্ত ভালবাসা, যে ভালবাসা প্রকাশে ভীরু আর লজ্জায় দুর্বল, সেই ভালবাসার উজ্জ্বল শিখাটি হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। মন বললে, রুমাবাঈও ভালবাসতে জানে।

এতখানি দুর্বলতা কি ক'রে রেখেছিল রুমাবাঈ, এতখানি অতৃপ্ত বাসনার গায়ে অপবাদের শাল জড়িয়ে রেখছিল কেন!

বিজনকে সে-কথা জিগ্যেস করবার জন্যে ফিরে তাকালাম হঠাৎ। দেখলাম, বিজনের দুচোখ বেয়ে জল ঝরে পড়ছে।

কান্না, কান্না। কিন্তু এ কান্নার খবর রাখলো না কেউ।

আনারবাগের দুর্নামী রটনা শুধুই মোতিকুমারীর বিয়ের সঙ্গে রুমা-বাঈয়ের বিমান দুর্ঘটনার যোগাযোগ আবিষ্কার ক'রে তৃপ্ত হলো।

বধূ কি বধূরা

নাম জানতো না ওরা। তাই নাম একটা তৈরী ক'রে নিয়েছিল। বধূমাতা। কেউ-বা অপভ্রংশ ক'রে বলতো, বৌমা। অবশ্য অন্তরঙ্গ আলোচনায়। আলাপে উল্লেখে তন্ময় হয়ে যেত সবাই। কখনো-বা উচ্ছ্বসিত। এমন মিঠে সৌন্দর্য, মোহ জড়ানো হাসি। নির্লাজ চাপল্য, অশঙ্কা চলন। দেহ আর দেহবাস সমান ছিমছাম, আভিধানিক অর্থে সত্যিকারের তন্বী। ফিতে পাড়ের ক্ষুদে ঘোমটা থাকে কি থাকে না। চকিত-চাঞ্চল্যে তখনই খসে পড়ে, তখনই টেনে দেয়।

ট্রাম ডিপোর সাম্‌নেই একটা স্টপেজ। কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় ভেজা টালির ছাউনী। গুমটিঘর। নানান্ মানুষ, মানান্‌সই শাড়ী জ্যাকেটের কত না মেয়ে। আসে যায়, থমকে থামে। কেউ ছোটাছুটি করে, কারো হয়তো প্রতীক্ষার পদচারণ। কত লোক আসে, কত লোক যায়। তবু চোখ পড়ে না।

সকালে, ঠিক্ নটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে এসে দাঁড়ায় ও। প্রতিদিনের মত।

আর সংযত সমস্বরে ওরা ব'লে ওঠে ; বধূমাতা !

চঞ্চল হয়ে উঠি, চোখ বাড়াই। ওকে দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠি আমিও।

গুমটিঘরের সাম্‌নে, ট্রাম লাইন আর পীচের রাস্তা পার হয়েই একটা চায়ের দোকান। গুমটিঘরের মুখোমুখি। মুখোমুখিই বসে ওরা এই দোকানটায়। আড্ডা, তর্ক, মীমাংসা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। ফুটপাথের পথচারী আর অপেক্ষমানা ট্রাম-যাত্রিণীদের সম্বন্ধে দু'চারটে টীকাটিপ্পনী। হাসাহাসি, রসিকতা নিজেদের মধ্যেই। লঘু-দৃষ্টি ছুঁড়ে দেয় সকলের দিকেই। সিনেমার ছবির মত প্রতি মুহূর্তে মিলিয়ে যায়, মুছে যায় মন থেকে। সমস্ত দিনের মধ্যে শুধু একটি আনন্দঘন মুহূর্ত। নটা পঁয়ত্রিশ মিনিট। এ ছবি মোছে না, এ ছাপ স্পষ্ট।

এতদিন শুনেই আসছি ওদের কাছে। ওদের উদ্‌ভ্রান্ত বর্ণনায় বধূমাতার ছবি এঁকে নিয়েছিলাম নিজের মনে। এতদিনে সুযোগ ঘটলো। দেখলাম চোখ চেয়ে, নিজের চোখে দেখলাম।

না, মুখটা তখনও দেখতে পাইনি। ছোটখাটো হাল্কা চেহারা, সাদা ধবধবে শাড়ীর প্রান্তে ইঞ্চিখানেক চওড়া রূপুলী পাড়, ভেলভেটের মত পালিস করা। বাঁ কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা গাঢ় নীল রঙের চামড়ার ব্যাগ। বাঁ হাতে ঝুলছে পাট করা আসমানী রঙের ওয়াটারপ্রুফ। ফিকে নীল, গাঢ় নীল। ছোঁয়া লেগে কিংবা ছায়া লেগে রূপুলী পাড়েও কেমন একটা নীলাভা। চোখের তারাতেও হয়তো দেখা যেত।

কিন্তু মুখ দেখিনি তখনও। চোখ দেখতে পাইনি।

খুটখুট ক'রে হাল্কা পায়ে এগিয়ে এলো ও। গ্রীসিয়ান মূর্তির পায়ে যেমন দেখা যায় তেমনি লাল সবুজ সাদার রঙ মেশানো স্ট্র্যাপবাধা স্যাণ্ডেল ওর পায়ে। একটু খাপছাড়া, একটু বেশী উজ্জ্বল। হয়তো চোখকে পায়ে নোয়াবার জন্মেই। কে জানে। কিন্তু, প্রয়োজন হয়তো ছিল না। চোখ এমনিই শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়ে।

—সহেলী ? কি ভাষায় কথা বলছিস্ ? ওরা প্রশ্ন করে।

অভিভূত ভাবটা কেটে যায়।

টার্লার ছাউনীটার নিচে এসে দাঁড়িয়েছিল ও। ট্রামের অপেক্ষায়। মুখোমুখি দেখতে পেয়েছিলাম ওকে, স্পষ্ট চোখে। আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেরই অজান্তে মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে পড়েছিল একটি শব্দ। —সহেলী।

ওকে এভাবে দেখবো, এতদিন পরে, ভাবতেই পারিনি।

চেয়ার ছেড়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলাম। একটু সন্দেহ। ভুল হয়নি তো ? না, এ মুখ ভুল হবার নয়, ভোলবার নয়।

ওর চোখ তখন অনেক দূরে! ট্রাম লাইনের সমতলে মিশে আছে বুঝিবা। ট্রামের আভাস পাওয়া যায় কিনা খুঁজছে।

সাম্‌নে এসে দাঁড়ালাম। ডাকলাম।—অনুরাধা!

চমকে চোখ ফেরালো ও। বিস্মিত হ'ল। হয়তো চিনতে পারেনি প্রথম দৃষ্টিতে। পরক্ষণেই পাহাড়-ভাঙা ঝর্ণার মত উচ্ছল আর সহজ হাস

চকচক ক'রে উঠলো ওর চোখের তারা। অনুভব করলাম, আমার দু কাঁধের ওপর দুটি নরম হাতের ঝাঁকানি।

—তুমি? চন্দনদা তুমি?

ওয়াটারপ্রুফটা ওর হাতে থেকে খসে পড়েছিল, কুড়িয়ে তুলে দিলাম ওর হাতে। তাকিয়ে দেখলাম ভালো ক'রে। খুশিতে ওর মুখ সহাস, চোখ সজল। তরল হীরের মত দুটো বিন্দু ফুটে উঠলো ওর চোখে।

বললাম, খুব রোগা হয়ে গেছিস।

—তাই বুঝি? খুব বিচ্ছিরি দেখতে হয়েছি, না? সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করলে।

বললাম, না। রোগা হয়েছিস, কিন্তু অনেক সুন্দরও।

ঠোঁট টিপে লাজুক হাসি হাসলে ও। তবু যেন বিশ্বাস করলে না। জিজ্ঞেস করলে, সত্যি?

ঘাড় কাৎ ক'রে জবাব দিলাম। বললাম, তারপর? কি খবর তোদের?

আঙুলে আঙুল জড়ালে ও।—উঃ, কদ্দিন পরে দেখা বলোতো? কি খবর বলবো, কোন খবরই তো জানো না।

বললাম, কাজের তাড়া আছে বুঝি? থাক্ তবে, পরে শুনবো।

অনুরাধা বাধা দিলো।—মরুক গে কাজ। চলো, অনেক, অনেক কথা আছে। তোমার খবরও তো কিছু জানি না ছাই। কি করছো, চাকরীবাকরী? বিয়ে করেছো? চলো, কোথায় যাই বলো তো? কোথাও বসিগে চলো, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েকি কথা বলা যায়।

কোথায় যাওয়া যায় ভাবলাম। খুঁজে পেলাম না। ও-ই হদিস দিলে শেষকালে।

বললে, পার্কের ঐ বেঞ্চিটা খালি আছে।

আমার সম্মতির জন্যে অপেক্ষা করলে না। পা বাড়ালে পার্কের দিকে। পাশে পাশে আমিও এলাম। এসে বসলাম বেঞ্চিটায়।

বর্ষাতিটা ধুপ ক'রে ফেললে একপাশে, কাঁধের ব্যাগটাও খুলে রাখলে কোলের ওপর। চোখে চোখ রেখে বললে, তারপর? তোমার কথা আগে শুনি।

শোনাবার কথা শোনালাম।

কাদা-মাখা কয়েকটা ছেলে ফুটবল খেলছে, সেদিকে উদাস চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো ও। শুনলো আমার সব কথা।

একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, ঘাসগুলো ভিজে ভিজে। শিরীষ গাছটা থেকে টুপটুপ ক'রে মোটা মোটা জলের ফোঁটা ঝরে পড়ছে। ফিকে হলুদ রোদের আভাস দেখা দিলো আকাশে।

আরো সুন্দর দেখালো অনুরাধাকে। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর সুডৌল হাতদুটোর দিকে, সরু সরু লম্বা আঙুলগুলোর দিকে। একটু যেন বিচলিত, একটু বা চঞ্চল মনে হ'ল।

হঠাৎ প্রশ্ন করলে আবার।—তবু, বিয়ে করলে না কেন?

হাসলাম।—এই বাজার, আর এই রোজগারে?

—দুঃখকষ্ট তো আছেই। তা ব'লে সরে পালাবে? তুমিও শেষে একথা বলবে চন্দনদা?

উত্তর দিতে পারলাম না। কি উত্তর দেবো? বললাম, তোর খবর বল্, কিছুইতো বললি না।

খবর? খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো অনুরাধা। —খবর নয় চন্দনদা, রীতিমত উপন্যাস। লেখো না তুমি, আমাকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখতে পারো না? ছেড়ে দিয়েছো বুঝি?

বললাম, আগে শুনি তো।

বলতে শুরু করলে ও। উপন্যাসই। রীতিমত একটা কাহিনী।

কে জানতো আবার মনে পড়বে, আবার দেখা হ'বে অনুরাধার সঙ্গে। সহেলীর সঙ্গে। কংসবতীর পাড়ে মেঠো ময়না আর গাংশালিকের বাসা। তার পাশেই নতুন জাগা উপনিবাস। আরো দূরে, মাইল পাঁচেক ব্যবধানে তখন গড়ে উঠছে নতুন শহর, রেল কলোনীর উপনিবেশ। আর সেই দূর শহরে জল জোগাবার জন্যে এই স্টেশন, সপ্তকূপ ওয়াটার-ওয়ার্কস। খান সাত-আট কোয়ার্টার—টালীর ছাদ, এক-ইঁটের দেয়াল। সঙ্গে বাঁশের বাতা দিয়ে ঘেরা ছোট-ছুটকো বাগান। কলার ঝোপ আর কুমড়োর ফুল। এটা ওটা।

পাশাপাশি থাকতাম আমরা। কতই বা বয়েস তখন। বারো তেরো

বছরও নয়। দেখাতো আরো ছোট। বেঁটেখাটো চেহারা ছিলো আমার, তার ওপর করমচার মত কচি আর গোলাপী মুখ। শুনেছি তো নিশ্চয়ই, অনেকের কাছে, তাছাড়া আয়নাতেও দেখতে পেতাম।

না, শুধু তাই নয়। লাজুকও ছিলাম একটু বেশিবেশি। বন্ধু ছিল শুধু অনুরাধা। ভাল লাগতো অনুরাধাকেই। মিশতামও ওরই সঙ্গে।

আধো আধো আদুরে কথা, চন্নদা, চন্নদা।

'চন্দন' বেরুত না ওর মুখ দিয়ে। অথচ বয়েসে ছিল প্রায় সমবয়েসী।

ভোর হয়তো তখনও হয়নি। আবছা আবছা অন্ধকার জমে রয়েছে গাছের পাতায়, ঘাসের ডগায়। কাশঝোপ আর শরবনে হয়তো ফিকে রূপোলী আলোর চমক দেখা দিয়েছে। অমনি দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ।

জাফ্‌রির ফাঁকে মুখ রেখে, চন্নদা, চন্নদা।

বিহারী চাকর ছিলো মঙ্গল। সেই ডেকে তুলতো আমাকে।

—খোকাবাবু, এ খোকাবাবু, সহেলী বুলা রহি। মঙ্গল চেঁচিয়ে বলতো।

জিজ্ঞেস করতাম, সহেলী আবার কি? সহেলী বলিস কেন, ওতো অনু, অনুরাধা।

মঙ্গল হাসতো, বোঝাবার চেষ্টা করতো 'সহেলী' শব্দের অর্থ। বুঝতাম না।

দিদিকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম। খুব ভালো হিন্দী জানতো দিদি।

বললে, 'সহেলী' জানিস না, সহেলী মানে 'সই'।

অনুরাধা তো হেসে লুটোপুটি।—ওমা ছেলেমেয়ে আবার সই হয় নাকি? সই তো মেয়েতে মেয়েতে হয়। না বাপু, তার চেয়ে মাস্টারমশায় বলবো আমি। কি সুন্দর অঙ্ক বুঝিয়ে দেয় চন্নদা।

ছেঁড়া ময়লা, ছোপ ছোপ কালি লাগানো খাতাটা বের ক'রে মাদুরের ওপর বসতো ও। শুরু হ'ত পড়াশুনোর ভাণ। তারপর আড়চোখে তাকাতে তাকাতে এক ফাঁকে সুড়ুৎ ক'রে দু'জনে বেরিয়ে পড়তাম ঘুড়ি-লাটাই হাতে নিয়ে।

এমনি ক'রে চলছিল জনবিরল আধা-শহুরে জীবন। বয়স যে বাড়ছে টের পাইনি।

হঠাৎ একদিন বাড়তি বয়সের একজনকে দেখলাম।

ছেলের নাম নয়নমণি। হো হো ক'রে হেসেছিলাম দু'জনেই। আর কি চেহারার ছিরি। প্যাকাটির মত লম্বা আর রোগা। শুধু কালো নয়, জমকালো। অনুরাধা হেসে বলেছিলো, উঁহু জমকালো, যমের মত কালো। খিল্ খিল্ ক'রে হেসে লুটিয়ে পড়তো ও নয়নমণির কথা উঠলেই।

নতুন ওভারসিয়ার বদলি হয়ে এসেছেন, তাঁরই ছেলে।

বীরবাবটি খুঁজতে বেরিয়েছি সেদিন। বর্ষাকালে ঘাসের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় ভেলভেটের মত নরম আর লাল পোকা। শিশিতে সিঁদুর আর ঘাস রেখে তার ভেতর ভরে রাখতাম। কখনো-সখনো হাতের পাতায় নিয়ে মন্ত্র আওড়াতাম। এমনিতে কুঁকড়ে পড়ে থাকে, আর ছড়া কাটা শেষ না হতেই সুড় সুড় ক'রে চলতে শুরু করে। এই সিঁদুরে মখমলের বীরবাবটি খুঁজতে বেরিয়েছি দু'জনে।

পোর্টারখুলি, অর্থাৎ কুলী-খালাসীদের লাইনবন্দী নোংরা খুপরির সারি পার হয়ে এসে পড়লাম টুক্‌রো একফালি খেনো জমির ওপর। নাঠে মাঠে কাটা ধানের গোড়া, পায়ে লাগে পথ চলতে। আঁকা-বাঁকা আল ধরে চলতে গেলেও পা পিছলে পড়ে ভিজে মাটির কাদায়।

রেল লাইনের পাশে পাশে বিছানো আছে দুর্বাঘাসের সবুজ গালিচা। অনুরাধার নির্দেশে সেই পথই ধরতে হ'ল। অনেক ঘোরাঘুরির পর ব্যর্থ মনে আর ক্লান্ত পায়ে ফিরছি তখন।

ঘড়ির কাঁটায় রাত বেজে গেল। তবু অন্ধকার তেমন ঘন হ'ল না। কোন শুক্ল তিথির চাঁদ-ঝরা রূপোয হয়তো মৌননিশীথ মাটিতে মুখ লুকিয়ে রইলো। শরমে সম্ভ্রমে।

মিষ্টি মিষ্টি জ্যোৎস্না, গাছ আর পাতার ভাঙা ভাঙা ছায়া। দূরের অন্ধকারে স্টেশনঘর আর ওয়াটার ওয়ার্কসের খুচরো আলোর জোনাকি।

দ্রুত পায়ে ফিরছিলাম। দু'জনে। দু'জনেই থমকে দাঁড়ালাম। কে যেন বাঁশী বাজাচ্ছে। মন উজাড় করা কাঁপা কাঁপা সুর। করুণ কান্নার রেশ যেন। বোবা বাঁশীর মুখে এত স্পষ্ট কাকলী শুনিনি। পাইনি মন ছোঁয়া এ গানের আবেশ।

রেল লাইনের তলা দিয়ে গেছে একটা ক্যানালের নালা। পোলের পাশেই

সিমেন্টে বাঁধানো কালভার্ট। আর তার ওপর বসে আপন মনে বাঁশী বাজাচ্ছে সিল্যুট শরীর একটি পুরুষ। নয়নমণি।

বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছে গেছি তখন। অনু, অনুরাধা তখন অবধি একটাও কথা বলেনি।

বললাম, কিরে, কথা বলছিস না যে?

খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো ও।—কালোমাণিক বেশ বাঁশী বাজায় কিন্তু, না চয়নদা'?

ওর হাসিতে বিদ্রূপ ছিলো, প্রশংসা নয়। তবু ভালো লাগলো না। এ যেন আমার অধিকারের ওপর অন্য কারো অকারণ হস্তক্ষেপ। মনে মনে চটে গেলাম নয়নমণির ওপর।

নয়নমণি আর অনুরাধার মাঝে যত উঁচু আর যত বড় সম্ভব পাঁচিল গাঁথলাম। কিন্তু, ফল হ'লো না। লুকিয়ে লুকিয়ে নয়নমণির গান শুনতে যেত ও, বাঁশী শিখতে। ওর মা আপত্তি করতেন, মেয়েছেলের আবার বাঁশী বাজানো কি? আমি নিষেধ করতাম। শুনতো না।

তবু, রোজ এসে বলতো নয়নমণির কথা।—কালোমাণিক যখন মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে গান গায় 'চয়নদা'······হেসে লুটিয়ে পড়তো ও।

আমার সাম্‌নেই একদিন সরল সহজ মেয়েটির মত বোকা বোকা চোখে বললে, নয়নদা, তুমি বুঝি আলকাতরার কারখানায় কাজ করতে?

বেচারীর কালো মুখখানা আরো কালো হয়ে গেল, অথচ এতটুকু দয়া দেখাচ্ছে না অনু। ওর সাম্‌নেই হেসে লুটোপুটি খেলো।

এমনিভাবেই চলছিলো দিন, বছর কাটছিলো।

কোলকাতায় এলাম কলেজে পড়তে। দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ হ'লো। তবু চিঠিপত্র লিখতাম মাঝে মাঝে। কবিতা লিখতাম, লিখে পাঠাতাম ওকে। গান জানি না, বাঁশী বাজাতে পারি না, তবু আরেকটা গুণতো আমার আছে। অনুরাধাও লিখতো চিঠি, যার একখানাও যদি নয়নমণি পড়তো তো আত্মহত্যা করতো সে। তবু ঈর্ষা দূর হ'ত না মন থেকে।

হঠাৎ আমাদের পত্রালাপে যতি পড়লো। খবর শুনলাম। অনুরাধাকে পাওয়া যাচ্ছে না। কলেজের ছুটিতে ফিরে এলাম। শুনলাম, আরো একজনকে পাওয়া যাচ্ছে না। নয়নমণি?

—শেষকালে কালোমাণিকের সঙ্গে পালাবো তুমি বোধ হয় ভাবতেই পারোনি, না চন্দনদা?' খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো অনুরাধা, যেন কত বড় একটা রসিকতা।

কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলাম। সহেলী, অনুরাধা। সেদিনের সেই সহজ সারল্য, আজকের এই আনন্দ উজ্জ্বল মুখ। এ মুখে যেন কথাগুলো বেখাপ্পা শোনালো।

বললাম, এখনো কালোমাণিক বলিস নাকি? সিঁথির সিঁদুরের রেখাটার দিকে চকিতে চোখ ফেলে বললাম, স্বামী না তোর?

সশব্দে হেসে উঠলো ও। পরমুহূর্তেই বিষণ্ণ ছায়া নামলো ওর চোখে।

—তখন আর না পালিয়ে উপায় ছিল না, তাই। তাছাড়া, কালো—, ফিকে হাসি হেসে বললে, তোমার আবার আপত্তি আছে বুঝি, তা নয়নদা কিন্তু সত্যি বড়ো বোকা, বড়ো বেশি ভালবাসতো আমাকে, বিশ্বাস করতো।

বললাম, পুরুষরা যখন ভালোবাসে তখন বিশ্বাসও করে।

নীল চামড়ার ব্যাগটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল ও। জীপ ফাসনারটা একবার খুলছিল, আবার বন্ধ করছিল।

হঠাৎ ব্যাগ থেকে একটা ফটো বের ক'রে বললে, কেমন দেখতে বলো।

একটি সুন্দরকান্তি পুরুষের ছবি। বললাম, সুন্দর নিশ্চয়ই।

—আমার স্বামী। হাসলো ও।

চট্ ক'রে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো আমার বিস্মিত মুখের ওপর।

বললে, নয়নদার গান আমাকে ভুলিয়ে ছিলো, ভুল পথে নিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু, কি জানো চন্দনদা, তোমার সেই কবিতা লেখা কিংবা নয়নদার গান এসব হ'ল খ্যাতির জন্যে। নাম করবে পাঁচজনে। যেমন ধরো পরীক্ষায় পাশ করা বা ব্যবসাদারী বুদ্ধি থাকা, এসব হ'ল টাকা রোজগারের জন্যে। তেমনি রূপ বা সৌন্দর্য না থাকলে ভালবাসা যায় না।

বললাম, এ সব জ্ঞান কবে থেকে হ'লো?

মুখটা ফ্যাকাসে হ'ল যেন ওর, আমার কথায় ঠাট্টার সুরটা ধরতে পেরেই হয়তো। খানিক মাথা নীচু ক'রে চুপ ক'রে রইলো ও, তারপর আস্তে আস্তে খুব স্পষ্ট আর শান্ত গলায় বললে, ছেলেটা মারা গেল হাসপাতালে। এদিকে নয়নদার রোজগারও ছিল কম, তাই টাইপ ইস্কুলে ভর্তি হলাম। এমনিতেই

ওকে সাহায্য করতে পারতাম না, টাইপটা শিখে নিয়ে যখন বুঝলাম চাকরী-বাকরী একটা চেষ্টা করলেই পাবো, তখন একদিন হঠাৎ উধাও হ'লাম। একেবারে ক'লকাতা।

চমকে উঠলাম। বলে কি ?

ও হাসলে।—কখনো কিছুতে ভয় পেতে দেখেছো আমাকে ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

ও আবার হেসে উঠলো।—তারপর আপিসেরই একজন, মিঃ আয়ার, বিয়ে করতে চাইলেন। রাজি হয়ে গেলাম। ফটো তো দেখলে, কি সুন্দর নয় চেহারাটা ?

একটা প্রশ্ন করবার ইচ্ছে হ'ল, নয়নমণির সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছিল কিনা। কিন্তু মুখে এলো না। কেমন বাধো বাধো ঠেকলো। শুধু বললাম, বাঙ্গালী নন ? চেহারা দেখে তো বাঙ্গালীই ভেবেছিলাম !

লাজুক হাসি হাসলে অনু।—আজকাল বেশ বাঙলা বলতে পারে। শিখে নিয়েছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম দু'জনে।

বললাম, সুখেই আছিস তা হ'লে। সুখে থাকবি তাই চেয়েছিলাম।

কথাটা শুনলো না ও, কিংবা শুনতে পেল না। হঠাৎ বললে, একটা কাজ করবে চন্নদা ?

—কি ?

অনুরাধার চোখজোড়া যেন চকচক ক'রে উঠল।—নয়নদা যাদবপুরে আছে, হাসপাতালে। টি. বি.-তে ভুগছে।......যাও না একদিন, দেখা ক'রে এসো। পুরোনো লোক দেখলে একটু শান্তি পাবে হয়তো।

বিস্ময় চাপা দিয়ে ঠিকানাটা জেনে নিলাম।—যাব একদিন।

—আমার ঠিকানাটাও রাখো। এক টুকরো কাগজে লিখে দিলে ও। বললে, যে কোনদিন সন্ধ্যে সাতটার পর। আসবে তো ?

ট্রামে উঠতে উঠতে বললে, রোববারেও তো আসতে পারো। যখন হোক্।

ঘাড় নেড়ে বললাম, যাবো।

সত্যি বলতে কি, অনুরাধার ঐ কমনীয় রূপ, ওর হাসির নির্মলিন নির্ঝর আমার মনের কোণে নূপুর বাজিয়ে গিয়েছিল সেদিন। কয়েক মুহূর্তের জন্যে হলেও, সে ঘুঙুরের বোল বুলবুলির সুরের মতই ছন্দোময় আর স্পষ্ট। তবু খুশি হতে পারিনি। উপন্যাস বুনতে বলেছিল অনুরাধা, ওর জীবনের কাহিনীকে ঘিরে। অথচ আমার মনে হয়েছিল, ওর জীবনের বৃত্ত থেকে গড়ে উঠতে পারে শুধু অপন্যাস।

অর্থাৎ, মনে মনে ক্ষমা করতে পারিনি ওকে।

কিন্তু, ওর হাসিতে বুঝি মোহ ছিল, চটুল চোখের চাউনীতে কোন নেশার আমেজ। আর ভোরবিহঙ্গের কণ্ঠকাকলি ওর গলার স্বরে।

তাই, সত্যি একদিন গিয়ে হাজির হলাম ওর বাসায়, ঠিকানা খুঁজে খুঁজে।

গলিটা কানা আর নোংরা। একটা ডাস্টবিন বাড়ীর সামনে। পচা ভাত, কলার পাতা। চিংড়ির খোসা, মরা ইঁদুর, ভাঙ্গা হাঁড়ি আর সরা। সবে মিলে গলিটাকে নোংরাই ক'রে তোলেনি, কিছুটা বীভৎসও। আর বাড়ীটাও পুরোনো। ভাঙ্গা ছাদের জলের ট্যাঙ্ক থেকে জল গড়িয়ে গড়িয়ে দেওয়ালের ইঁট অবধি ক্ষয়ে গেছে। তারই ভেতর, এক কোণের দু'খানি ঘর।

তবু পরিচ্ছন্ন। সাজানো গোছানো।

একটা ডেক চেয়ারে শুয়েছিলেন কৃষ্ণকান্ত্ আয়ার। অনুরাধা আলাপ করিয়ে দিলো।

দুটো হাত তুলে নমস্কার করবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। বছর চারেক হ'ল জীবনের রস হারিয়ে ফেলেছেন, গাঢ় দুঃখের স্বরে বললেন কৃষ্ণকান্ত্। দেহের বাঁ দিকটা প্যারালিসিসে পড়ে গেছে।

আমার নাম ব'লে আলাপ করিয়ে দিলো অনু।—আমার ছোটবেলাকার বন্ধু।

কৃষ্ণকান্ত্ হাসলেন।—আপনার নাম রাধার মুখে আমি শুনিনি কিন্তু কখনও।

বছর আট নয়ের একটি ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে, আর দুটি ছেলে। সামনে এসে হাজির করলে অনুরাধা। বললে, প্রণাম করো। মামা হন।

ওরা প্রণাম করলো এক কথায়। কাছে টেনে নিলাম একজনকে।

আর কৃষ্ণকান্তের সঙ্গে গল্প করতে করতে লক্ষ্য করলাম অনুরাধাকে। কি চঞ্চল আর কি তৎপর। এই কি স্বাভাবিক রূপ? সত্যি, আশ্চর্য হলাম।

সাদাসিধে একটা লালপাড় শাড়ী। আলুথালু চুল। অতি ব্যস্ততায় কপালে ঘাম, কপোলে রক্তিমাভা। এক ফাঁকে এসে ঘরটা ঝাঁট দিয়ে গেল, ময়লা কাপড় গুছিয়ে রাখলে আলনায়। আবার তখনই ছুটলো, যাই উনুনটা ধরলো কিনা দেখি।

মেয়ের ফ্রক পাল্টে দিলে, চিবুক ধরে চুল আঁচড়ে দিলে। ফ্রকটা দেখিয়ে বললে, নিজের হাতে করেছি, কেমন হয়েছে বলো তো চন্দনদা?

আমি কিছু বলবার আগেই জুড়ে দিলে, নিজের হাতে সেলাই কিন্তু, মেসিনে নয়। হানিকুম্বটা ভাল হয়নি?

কবরেজি তেলটা নিয়ে এসে কৃষ্ণকান্তের হাতেপায়ে মালিশ করতে করতে গল্প শুরু করলে আবার।

কৃষ্ণকান্ত অপাঙ্গে হাসলেন।—রাধার মত মেয়ে কিন্তু আপনি আর একটিও পাবেন না। ইউ হ্যাভ মিস্‌ড হার, মিস্‌ড এন আইডিয়েল ওয়াইফ। ছোটোবেলাতেই যখন অপারচুনিটি পেয়েছিলেন……

অনুরাধার চোখে কপট ভর্ৎসনা।

না হেসে পারলাম না।

কৃষ্ণকান্ত হেসে বললেন, হাসি নয়। চার বচ্ছর পড়ে আছি প্যারালিসিসে, একটা পয়সা রোজগার নেই। অ্যাণ্ড দি হোল বার্ডেন ইজ অন রাধা।

বাকীটা শুনলাম অনুরাধার কাছে, বললে, কি আর এমন শক্ত কাজ। চাকরী তো দশটা পাঁচটা। সকালে এক ঘণ্টা একটি মেয়েকে সেলাই শেখাই, রাত্রে দু'ঘণ্টা গানের মাষ্টারী।

তারপর হঠাৎ হেসে উঠে বললে, দোহাই তোমার, গল্পটল্প লেখো কিনা জানি না। লিখলে, আর সকলের মত সেই একই গল্প লিখো না। বিশ্বাস করো, কাজ করেও রুগ্ন স্বামীর সেবা করা যায়, সংসার খরচের টাকা, ছেলেমেয়েকে ইস্কুলে পড়ানো—এসব ভার নেয়াও অসম্ভব নয় মেয়েদের পক্ষে।

চলে আসছিলাম। ও আবার ডাকলে।

—যাবে নাকি একদিন, নয়নদাকে দেখতে।

বললাম, যাবো তো নিশ্চয়ই। তুইও চল না সঙ্গে।

ও বিব্রত হয়ে উঠলো।—না, না। ছিঃ, তাই কি চলে। ভালোও দেখায় না, উচিতও নয়।

ইচ্ছে হয়তো সত্যিই ছিল না। তবু একদিন গেলাম হাসপাতালে, নয়নমণিকে দেখতে।

কলার ঝোপ আর জলো নালার পচানি, এরই মাঝ দিয়ে গেছে ভাঙা-চোরা কাঁচা রাস্তা। আর মটরবাসে তেমনি ভীড়। তবু গেলাম। দেখতে, দেখা করতে।

দেখলাম শহরতলীর অপরূপ সায়াহ্ন। শান্তি। নিম আর নাম্নভোমিকার ছায়া, মাঝে মাঝে জাহাজের মাস্তলের মত দীর্ঘ মসৃণ ইউক্যালিপটাসের সাদা গুঁড়ির পরিচ্ছন্নতা। আড়ালে লুকানো ছায়ায় ভেজা হাসপাতাল। ঠাণ্ডা, শান্ত, নিঃশব্দ। বরফের দেশের মত, বরফের ঘরের মত। চুপচুপ। ফিসফিস। সুরের তেজ নেই, শব্দের তীক্ষ্ণতা নেই।

বারো-দরোজার লম্বা লম্বা ঘর পার হয়ে ওয়ার্ড খুঁজে পেলাম। বেড নম্বর সতেরো। ঠাণ্ডা, নিঃঝুম। সমস্ত ঘরখানায় সারি সারি, সরু সরু লোহার খাট। ধবধবে ফর্সা চাদরে ঢাকা। দেয়ালের গায়ে, বিছানা বালিশের শুভ্রতায়, কর্মচঞ্চল নার্সের বসনেভূষণে মহাশান্তির শ্বেতাভা যেন। কেমন এক করুণা-কোমল আবহাওয়া সারা ঘরের বাতাসে।

শুয়ে শুয়ে পড়ছিল নয়নমণি। নার্স একটা টুল টেনে দিলো ওর পায়ের কাছে। বসতে বললে আমাকে সহাস অনুরোধে। নয়নমণি বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকালে আমার দিকে। বিস্মিত হ'ল। দোষ কি ওর, চিনতে না পারারই কথা।

সব শুনে ম্লান হাসিতে উজ্জ্বল হবার চেষ্টা করলে ও।

দু'তিনখানা ঘরের ওপার থেকে কার ভাঙা গলার কাশির শব্দ আসছে আর নার্সের জুতোর খুটখুট খুটখুট শব্দ। চঞ্চল পায়ে ঘোরাফেরা করছে সারা ঘরময়। আরো কারা যেন অন্য অন্য রুগীদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

হাতের বইটা বুকের ওপর রেখে নয়নমণি বললে, অনেক বড়ো হয়েছো, মাথাতেও লম্বা হয়েছো অনেকটা, তাই চিনতে পারিনি প্রথমে।

বললাম, অনুরাধাও প্রথমে চিনতে পারেনি। ওর কাছেই খবর পেলাম আপনার। খবর পেলাম বলবো না, ওই একরকম জোর ক'রে পাঠালো আমাকে।

নয়নমণিকে আমি কোনোদিন পছন্দ করিনি। কেন জানি না, মন বলতো ও আমার শত্রু। তবু, ওর দুঃখ ওর ব্যথা-বেদনার ছোঁয়া পেলাম যেন। এই অসহায় রোগশয্যা। তিলে তিলে ক্ষয়ে যাওয়া, প্রবঞ্চনার গভীর ক্ষত, অনুরাধার ব্যঙ্গবিদ্রূপ প্রতারণা। হঠাৎ কেমন যেন বড়ো আপনার জন মনে হল নয়নমণিকে। বড়ো অন্তরঙ্গ মনে হ'ল।

ওকে খুশি করবার জন্যেই হয়তো বললাম, অনু প্রায়ই আপনার কথা বলে।

বিষণ্ণ হাসি হাসলে ও।—একটা দিন, কয়েক মিনিটের জন্যেও কি ও দেখা দিতে পারে না একবার। বড়ো দেখতে ইচ্ছে হয়। কত কথা বলবার ছিল।

দীর্ঘশ্বাস ফেললে নয়নমণি।

আশ্চর্য। একবারও ভাবিনি, এক মুহূর্তের জন্যেও মনে হয়নি যে অনু-রাধা আমাকে আসতে বলেছে বারবার, অথচ নিজে একদিনের জন্যেও আসেনি, দেখতে বা দেখা দিতে। মনটা বিষিয়ে উঠলো অনুরাধার ওপর। মনে হল, নয়নমণির এ অবস্থার জন্যে অনুরাধাই দায়ী, একমাত্র অনুরাধাই দায়ী।

তবু বললাম, সকাল বিকেল মাস্টারী করা, দুপুরে চাকরী, তার ওপর ঘর-সংসার দেখা-শোনা। সময় পায় না বেচারী।

আবার একবার দীর্ঘশ্বাস ফেললে নয়নমণি। বড় বেশি ফ্যাকাসে দেখালো ওর মুখখানা। চোখের তারা দুটো যেন জ্যোতি হারিয়েছে। সিলিং-এর দিকে চোখ রেখে শুয়ে রইলো চুপ ক'রে।

তারপর হঠাৎ বলল, বাঁচবো না আর বেশিদিন। আর বেঁচে থেকে মিছিমিছি কষ্ট দেওয়া।

বুঝলাম না কথাটা। চুপ ক'রে রইলাম।

ও আবার বললে, সারাটা জীবন শুধু ওকে দুঃখই দিলাম। জানো ভাই চন্দন, অনুরাধার মত মেয়ে আর একটাও দেখতে পাবে না। এতো ভালো মেয়ে, এতো সাহস আর ধৈর্য!

বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে।

নয়নমণি হাসলো।—কেউ জানলো না, শুনলো না। চন্দন ভাই, তুমি অন্ততঃ জেনে রাখো, অনু সাধারণ মানুষ নয়। সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক অনেক ওপরে ও। প্রথম যেদিন আমার মুখ দিয়ে রক্ত উঠলো সেদিন একটা পয়সা রোজগার নেই আমার। এক হপ্তা পরেই অনুও হ'ল নিরুদ্দেশ। ভেবেছিলাম, রোগের ভয়ে বুঝি পালিয়েছে। সশব্দে হেসে উঠলো নয়নমণি।

অনুরাধার কথাটা মনে পড়লো।—রূপ না থাকলে কি ভালবাসা যায়, চন্দনদা!

নয়নমণি বললে, আরো অনেক কিছু ভেবেছিলাম সেদিন। অথচ আমাকে বাঁচাবার জন্যেই চলে এসেছিল ও। চাকরী ক'রে টাকা রোজগার করবার জন্যে, ভাল ডাক্তার দেখিয়ে আমার চিকিৎসা করাবার জন্যে।

এক তাড়া চিঠি বের করলে নয়নমণি, বিছানার নীচে থেকে।

—এই যে, এই চিঠিটা পড়ো, অনুরাধা লিখেছিলো।

চিঠিখানার ওপর চোখ বুলিয়ে গেলাম, পড়া হ'ল না। নয়নমণির কথা শোনবার জন্যে সমস্ত মন তখন উদগ্রীব।

—অনেক চেষ্টায় বেড জোগাড় করলে, পেণ্ড্রা রোড থেকে আনলে এখানে। এই রাজসিক রোগ, জানো তো কত খরচ, সব খরচ চালিয়ে এসেছে অনু, অনুরাধা। গত হপ্তাতেও চিঠি দিয়েছে, আমি ভালো হয়ে গেছি, ও নাকি স্বপ্নে দেখেছে।

হেসে উঠলো নয়নমণি।—বোকা মেয়ে, এত সরল বিশ্বাস ওর। আমি আবার ভালো হবো, আমি আবার ফিরে যাবো! কিন্তু ও আসে না কেন একদিন, একবার কি দেখা করতে পারে না?

বললাম, আমি ফিরে গিয়ে বলবো, নিশ্চয়ই নিয়ে আসব একদিন।

নয়নমণি ম্লান হয়ে গেল হঠাৎ। না, না, ও আসবে না। আসবে না ও।

বাধা দিলাম না। প্রতিশ্রুতি দিলাম না। হয়তো সত্যিই আসবে না অনুরাধা।

আরো কিছুক্ষণ কাটালাম। সেই ছোটবেলাকার কত কথা, কত গল্প। এক সময় উঠে এলাম বিদায় নিয়ে। বেরিয়ে এলাম।

অনুরাধাকে এসে বললাম, অনেকগুলো প্রশ্ন আছে, জবাব দাও।

কেন জানি না, ওকে আর আগের মত 'তুই' সম্বোধন করতে বাধলো।

ও হাসলো।—বল কি তোমার প্রশ্ন।

—নয়নমণিকে তুমি সত্যি ভালবাসতে, ভালবাসো। তবু, একটা দিনের জন্যেও কেন দেখা করতে যাওনি? তোমাকে দেখলে ও হয়তো কিছুটা শান্তি পেত। আরাম পেত।

অনুরাধা হেসে উঠলো।—ভালবাসতাম? ভালবাসি? খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো ও আবার।—কালোমাণিকের বুঝি তাই ধারণা?

রাগ হলো, বিরক্তিও বোধ করলাম। বুঝলাম, উত্তর ও দেবে না এ প্রশ্নের।

বললাম, আরেকটা প্রশ্ন, কৃষ্ণকান্তকে তুমি বিয়ে করলে কেন?

—বিয়ে না ক'রে জীবনটা নষ্ট করলেই বুঝি ভালো হত?

অতিষ্ঠ হয়ে বললাম, একটা কথা বলো, তুমি কাকে ভালবাসতে, ভালবাসো? নয়নমণি না কৃষ্ণকান্ত্। নাকি দু'জনকেই?

আবার খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো অনুরাধা।—যদি বলি তোমাকে?

এত রাগেও হাসি পেল। বললাম, তা হলে নয়নমণিকে সারিয়ে তোলার জন্যে রক্ত জল করতে না, আর প্যারালিটিক কৃষ্ণকান্তের সংসারেও মায়া থাকতো না তোমার।

কোন উত্তর দিলো না অনুরাধা। চকিতে একবার তাকালো আমার মুখের দিকে। পরমুহূর্তেই চলে গেল চা তৈরী করতে। যখন ফিরে এলো, মনে হলো, চোখেমুখে যেন জলের ঝাপটা দিয়ে এসেছে ও।

পরজে বসন্ত

এতক্ষণ খবরের কাগজটার মধ্যে ডুবেছিল প্রশান্ত। কাগজটাকে চার ভাঁজ ক'রে হঠাৎ বললে, একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিস্?

আমরা তর্ক থামিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম।

প্রশান্ত বললে, আবার দেখছি আত্মহত্যার হিড়িক লেগে গেছে। কাগজ খুললেই দু'চারটে সুইসাইড কেস দেখতে পাওয়া যায়।

সলিল শুনে হাসলো।—তোর কি ধারণা এতদিন সুইসাইড বন্ধ ছিল? আসলে এ-সব খবর ছাপা বন্ধ ছিল কিছুদিন, আবার শুরু হয়েছে।

প্রশান্ত সায় দিলে।—তা হতে পারে। সেই যে টেলিফোন আপিসের চারতলার জানালা থেকে লাফিয়ে পড়ে একটি মেয়ে আত্মহত্যা করেছিলো তারপর অনেকদিন এ ধরনের খবর বেরোয়নি।

—কিন্তু আজকের কাগজে কি তেমন কোন ইণ্টারেস্টিং……

প্রশান্ত নাক সিঁটকে বললে, কেন যে কাগজটা নিয়ে এতক্ষণ আগলে আগলে রাখিস্ তোরা, বুঝি না। খেলার পাতা ছাড়াও আর সাতটা পাতা যে ছাপা হয় সেগুলোর ওপর একটু চোখ বুলিয়ে দেখিস্।

সলিল বললে, বাকী পাতাগুলোতেও যদ্দিন না খেলার খবর বা সিনেমার ছবি দিচ্ছে তদ্দিন নয়। কিন্তু আত্মহত্যার ওপর চোখ গেল কেন তোর হঠাৎ?

প্রশান্ত বললে, আজকের কাগজে দুটো আত্মহত্যার খবর আছে, এবং পরস্পরের সঙ্গে কোন যোগাযোগ থাকলে ব্যাপারটা ইণ্টারেস্টিং।

বললাম, টীকাটিপ্পনি বাদ দিয়ে ঘটনাটা কি বল।

প্রশান্ত খবরের কাগজটার ভাঁজ খুলতে খুলতে বললে, জনৈক যুবককে, বয়স অনুমান পঁচিশ, গতকাল রাত্রি দশটার সময় একটি ঘরে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পাওয়া যায়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই তার মৃত্যু হয়। যুবকটি বিষপান ক'রে আত্মহত্যা করেছে ব'লে সন্দেহ করা হচ্ছে।

সলিল বললে, অর্থাভাব। বে-সরকারী তদন্তের ফলে প্রকাশ পাবে 'যুবকটি গত ছয়মাস যাবৎ চাকুরীর খোঁজে ব্যর্থ চেষ্টা' ক'রে শেষকালে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। আর তিনমাস পরে সরকারী তদন্তের পর ডিরেক্টর অব পাবলিসিটির দপ্তর থেকে প্রতিবাদ আসবে লোকটি দিব্যি খেতে-পরতে পেতো।

আমি বললাম, অন্য কারণও থাকতে পারে। বিশেষ ক'রে যুবকটির বয়স যখন পঁচিশ।

সলিল হেসে বললে, না, ব্যর্থপ্রেমিক হ'লে সে লেকের জলে ডুবতো এবং নিশ্চয়ই পকেটে একটা চিঠি রেখে যেতো।

প্রশান্ত বললে, কিন্তু এই পাঁচ লাইন খবরের নীচেই আরেকটি খবর আছে। জনৈক তরুণী, বয়স আঠারো, একটি মেয়ে কলেজের হস্টেলে ঐ সময়েই উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছে।

আমি বললাম, তা হ'লে দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে যে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। সম্ভবতঃ ছেলেটির গোঁড়া বাপ-মা এর জন্তে দায়ী।

প্রশান্ত হেসে বললে, আত্মহত্যার খবর শুনলেই আমরা বেশ একটি প্রেমোপাখ্যান কল্পনা ক'রে নিই। কিন্তু আমার ধারণা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ ধরনের কোন কারণ থাকে না।

সলিল বললে, আত্মহত্যা সাময়িক ইনস্যানিটির ফল। সাধারণতঃ খুব ছোটখাটো কারণেই লোকে আত্মহত্যা করে। আমার এক আত্মীয়ের দশ বছর বয়সের মেয়ে তার মার কাছে বকুনি খেয়ে পুকুরে ডুবে সুইসাইড করেছিল। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা নির্ঘাৎ...... ..

আমি বললাম, পাখা বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

এবার সলিলের পালা, তাই হঠাৎ বাধা পেয়ে ও ওপরে তাকালো, পাখা যে সত্যিই বন্ধ হয়ে গেছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হ'ল এবং তারপর বয়কে ডেকে অর্ডার দিলে, একা সা।

স্যান্ডুভ্যালীর বয় অর্থাৎ ছেঁড়া ময়লা সার্ট আর ইজের পরা বাচ্চাটা এসে দাঁড়ালো।

জিজ্ঞেস করলে, ডলাফ ?

অর্থাৎ, ডবল হাফ ?

সলিল ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ম্যানেজারের দিকে তাকালো এবং ম্যানেজার তার মাথার পিছনে হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপতেই ও বললে, প্রেম সংক্রান্ত কিছু না থাকলে দু'জনে একই দিনে একই সময়ে আত্মহত্যা করতো না।

প্রশান্ত বললে, কিন্তু একটি কথা বলা হয়নি।

আমরা উৎকর্ণ হ'লাম।

প্রশান্ত হেসে বললে, যুবকটির আত্মহত্যার খবর এসেছে পাটনা থেকে, আর তরুণীটি কোলকাতার।

সলিল রেগে গিয়ে বল্লে, এ কথাটা আগে বললেই হ'ত।

প্রশান্ত হো হো ক'রে হেসে উঠলো এবং তারপর হাসি থামিয়ে বললে, একটি আত্মহত্যার ঘটনা আমি স্বচক্ষে দেখেছি এবং তেমন রহস্যজনক সুই-সাইড আর কেউ দেখেছে কিনা সন্দেহ।

আমি বললাম, এবার পাখা বন্ধ হ'লে আমি চায়ের অর্ডার দিতে রাজি আছি যদি গল্পটা আমাকে লিখতে না বলিস।

প্রশান্ত বললে, বলবো ব'লেই এ প্রসঙ্গ তুলেছিলাম। কিন্তু সে গল্পের মাঝখানের কথাটা সবশেষে বলতে হ'বে, অথচ সে-কথা শেষে বললে সলিল আবার চটে গিয়ে বলবে, এ-কথা আগে বললেই হ'ত! তার চেয়ে ব্রজর বৌ কেন আত্মহত্যা করেছিল সে গল্প মুলতুবি থাক।

আমি বললাম, কোন্ ব্রজ? ব্রজেন দত্ত?

প্রশান্ত সলিলের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মৃদু হেসে বললে, হ্যাঁ, আমাদের রেকর্ড সেকশনের ব্রজ।

সলিল বললে, রেকর্ডের ব্রজ তো এই সেদিন বিয়ে করলো?

—আমি বলছি তার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কথা। প্রশান্ত বললে।

আমি বললাম, এটা ওর দ্বিতীয় পক্ষ, তা তো জানতাম না।

—আর প্রথমা স্ত্রী ওর সুইসাইড করেছিলো? কেন? সলিল জিজ্ঞেস করলো।

প্রশান্ত বললে, কেন তা আমরাও বুঝতে পারিনি। আর ও যে কি ক'রে দ্বিতীয়বার বিয়ে করলো তাও বুঝতে পারি না।

সলিল বললে, প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুতে শ্মশান-বৈরাগ্যের ফলে ইয়া মোটা বই লিখে সে-বই দ্বিতীয়া স্ত্রীকে উৎসর্গ করতে দেখা গেছে।

আমি বললাম, মানুষের কথা হ'চ্ছে, সাহিত্যিকের নয়। যাক্ ওসব কথা, ব্রজর প্রথম বৌ কেন আত্মহত্যা করেছিল বল।

প্রশান্ত বললে, স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্······কি যেন আছে, মানে দেবতারাও জানেন না—তা সেই কথা প্রমাণ করবার জন্যেই নীলিমা গলায় দড়ি দিয়েছিল।

সলিল বললে, বুঝেছি। নীলিমা, মানে ব্রজর প্রথম বৌ, আনকেথফুল ছিল।

আমি বললাম, বাজে কথা। ব্রজর মা বোধ হয় খুব জ্বালাতো তাকে। আর আত্মহত্যার পর নিজের দোষ ঢাকা দেবার জন্যে বৌটির নামে অপবাদ দিয়েছিলো।

—কিংবা ব্রজ হয়তো······সলিল কি যেন বলতে যাচ্ছিল।

প্রশান্ত বাধা দিয়ে বললে, ব্রজর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আজ পনেরো বছর। যা সন্দেহ করছো তা নয়। তাছাড়া, ব্রজ আর নীলিমা আমাদের সকলের চোখেই ছিল আদর্শ স্বামী-স্ত্রী।

—তবে? কেন, আত্মহত্যা করলো কেন? আমি জিগ্যেস করলাম।

প্রশান্ত বললে, আমরাও সেদিন এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাইনি। কারণ, ওরা দু'জনেই যে সুখী ছিল তাই নয়, ব্রজর মা'ও দেখেছি বৌমা বলতে অজ্ঞান। সংসারের এতটুকু কাজ করতে দিতেন না, আর সব সময়ে তাঁর বৌমার প্রশংসা। তাছাড়া, বিয়ের দিন থেকেই আমি নীলিমাকে দেখে এসেছি। এত সরল, এমন বোকাবোকা······ও মেয়ে কখনো অসতী হবার কথা ভাবতেও পারতো না।

—সলিল বললে, সব অসতী মেয়েই স্বেচ্ছায় ও পথে যায় না। অনেক সময় পুরুষরা তাদের বোকামির সুযোগ নেয় এবং যখন তারা চালাক হয়ে ওঠে তখন আর উপায় থাকে না।

প্রশান্ত বললে, ব্রজদের বাড়ীতে ব্রজই ছিল একমাত্র পুরুষ এবং ওর মা এমন গোঁড়া ছিলেন যে কেউই অন্দরমহলে ঢুকতে পেতো না। ব্রজর খুব ছোটবেলাকার বন্ধু ব'লে একমাত্র আমি ঢুকতে পেতাম, এবং আমাকে যদি বিশ্বাস করিস তো বলি যে নীলিমার কোন খুঁৎ, নীলিমা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ আমার মনে উঁকি দেয়নি।

সলিল বললে, তা হ'লে ও পাগল হয়ে গিয়েছিল, এ ছাড়া ওর আত্মহত্যার কি কারণ থাকতে পারে?

প্রশান্ত বললে, হ্যাঁ, প্রেমে পাগল। স্বামীর প্রেমে পাগল হয়ে গিয়েছিল নীলিমা। ব্যর্থ প্রেমে যেমন আত্মহত্যা করে, তেমনি প্রেমে সার্থক হ'লেও···

আমি বললাম, আজগুবির একটা সীমা আছে।

—কিন্তু ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন। প্রশান্ত বললে। তারপর হাত বাড়িয়ে বললে, দে একটা সিগারেট দে।

সলিলের চা শেষ হয়ে এসেছিল, আরেকটু দেরী হ'লেই হয়তো পাখা বন্ধ হয়ে যেতো, আমি বললাম, এই বাচ্চা, এক্কা সা !

তারপর প্রশান্তকে বললাম, বল্ তোর ট্রুথটাই শুনি তা হ'লে।

প্রশান্ত বললে, বেশীদিনের কথা নয়, বছর পাঁচেক আগের ঘটনা। রাত এগারোটা কি সাড়ে এগারোটা। বৃষ্টি পড়ছে খুব। সবে তন্দ্রাটা এসেছে, হঠাৎ কড়া নাড়ার আওয়াজ হ'ল। প্রথমটা ভেবেছিলাম অন্য বাড়ী, শেষ পর্যন্ত উঠে আসতে হ'ল। এসে দেখি কাচুমাচু মুখ ক'রে সোমেন দাঁড়িয়ে আছে। কপাট খুলতেই বললে, ব্রজর বৌ আত্মহত্যা করেছে, চল, শীগ্‌গির।

আত্মহত্যা করেছে ? বলে কি ? প্রথমটা বিশ্বাসই হয়নি। তবু পাঞ্জাবীটায় কোনরকমে মাথা গলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

রাস্তায় বেরিয়ে সোমেন বললে, মড়া পোড়াতে যেতে হবে।

বললাম, সে কি ? সুইসাইড কেস বলছিস, মর্গে নিয়ে যাবে না ?

সোমেন বললে, সে-সব চাপাচুপি দেবার ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

ব্রজদের বাড়ীতে পৌঁছে দেখি সত্যি তাই। বেশ একটা দামী খাটে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে নীলিমাকে, আর ফুলে ফুলে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে। কিন্তু নীলিমার মুখে কোন দুঃখকষ্টের চিহ্ন নেই, যেন ঠোঁট টিপে হাসছে।

আমি বললাম, গলায় দড়ি দিয়ে যে আত্মহত্যা করে তার মুখে হাসি থাকতে পারে না।

সলিল বললে, প্রশান্তটার সব ব্যাপারেই কবিত্ব।

প্রশান্ত বললে, আমি যা দেখেছি তাই বলছি, বিজ্ঞানচর্চা করছি না।

বললাম, বেশ বল্ তারপর। গল্পটা যখন তোর, গরুকে গাছে চড়াবার অধিকার তোর আছে।

প্রশান্ত বললে, দেখলাম এক কোণে মেঝের ওপর বসে আছে ব্রজ, দু'হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে।

বললাম, এটা স্বাভাবিক।

প্রশান্ত বললে, সবটা শুনলে বুঝবি, তা নয়। অনেক দুঃখের মধ্যেও সেইটেই ব্রজর সবচেয়ে সুখের দিন।

সলিল বললে, কি বলছিস্ যা তা। বৌ মারা গেছে আত্মহত্যা ক'রে, আর সেটা কিনা ব্রজর সুখের দিন?

প্রশান্ত বললে, এ সংসারে কিছুই বিচিত্র নয়। তা না হ'লে ব্রজর মা যখন সুর ক'রে ক'রে কাঁদছেন তখন পাড়ার এক বুড়ো নিজের প্রতিপত্তি জাহির করে? এমন ফুলের মত রূপ, সে মেয়েকে নাকি মর্গে কেটে ফালি ফালি করতো, শুধু তাঁর সঙ্গে হোমরাচোমরা লোকদের আলাপ আছে তাই।

আমি বললাম, যাক্ পোষ্ট মর্টেমের জন্যে টানা-হেঁচড়া করেনি তা হলে?

প্রশান্ত বললে, তারজন্যে টাকাও কম খরচ করতে হয়নি ব্রজকে।

সলিল বললে, টাকা খরচ ক'রে চাপা দিতে হয়েছে? তা হ'লে তো কেমন সন্দেহ রয়ে যাচ্ছে।

প্রশান্ত বললে, এমন অবস্থায় পড়লে তুইও চাপা দিতে চাইতিস্। বাড়ীর বৌ আত্মহত্যা করেছে, কে এ খবর কাগজে জানাজানি করতে দিতে চায়? লোকে তো আর দেখবে না, কি কারণ, ধরবে স্বামীর অপরাধ আর নয়তো শাশুড়ীর অত্যাচার।

বললাম, কথাটা অবশ্য সত্যি।

প্রশান্ত বললে, তা ছাড়া ঘটনাটা ঘটেছিলো ব্রজর বিয়ের ঠিক ছ'মাস পরে। তাই লজ্জায় ব্রজ মুখ তুলে তাকাতে পারছিলো না। আর ব্রজর মা তো আমার সঙ্গে কথাই বলতে পারেননি বহুদিন পর্যন্ত।

সলিল হঠাৎ বললে, আত্মহত্যা বটেতো? বিষটিষ খাইয়ে শেষে আত্মহত্যা ব'লে চালায়নি তো?

এ-কথা শুনে প্রশান্ত কটমট ক'রে ওর দিকে তাকালো, উত্তর দিলে না। কিছুক্ষণ পরে বললে, নীলিমার বাবা এবং একজন সম্পর্কে দাদা—দ্বিজেনবাবু না কি নাম, এ দু'জনও খবর পেয়ে এসেছিলেন। শ্মশানে গিয়েছিলেন তাঁরা দু'জনেই। তেমন কোন সন্দেহ থাকলে তাঁরা কি ছেড়ে কথা কইতেন?

সলিল বললে, একথা আগে বললেই হ'ত।

প্রশান্ত বললে, একদিন মনে আছে, গিয়ে বললাম, চা খাওয়াও চট্‌পট্‌। অমনি নীলিমা এক গ্লাস জল নিয়ে এসে হাজির। বললাম, এ কি, চায়ের সঙ্গে কি জল দেয় নাকি তোমাদের দেশে। তা চট্‌ ক'রে কি বললে জানিস্‌? বললে, জল দেয় না, তবে চায়ের সঙ্গে টা দেয় আর টায়ের সঙ্গে জল। এই ব'লে এক থালা সন্দেশ নিয়ে এলো।

বললাম, তোর খাওয়ার গল্প রাখ। শ্মশানে গিয়ে কি হ'ল বল্‌।

—শ্মশানে গিয়ে? প্রশান্ত আমার কাপটায় একবার উঁকি দিয়ে বললে, শ্মশানে যখন চিতায় আগুন ধরানো হ'ল তখন সেই সম্পর্কের দাদা দ্বিজেনবাবু সে তো হাউহাউ ক'রে কেঁদে উঠলো। নীলিমার বাবা কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন পাথরের মূর্তির মত।

আমি বললাম, বুঝেছি, এই দ্বিজেনবাবুই আসল কালপ্রিট।

প্রশান্ত বললে, আমাদেরও প্রথমে সেই ধারণাই হয়েছিল। আর সেই-জন্যেই ব্রজ আমাদের এড়িয়ে এড়িয়ে চলে, আমরা ভেবেছিলাম। ব্রজর হয়তো ধারণা হয়েছিল, পৃথিবীশুদ্ধ সকলেই ওকে দোষী করছে। আর সত্যিই তাই, আমরা ভেবেছিলাম, স্বামীর সঙ্গে কোন অমিল বা মনোমালিন্যের জন্যেই হয়তো নীলিমা আত্মহত্যা করেছে। আর যে সুখের অভিনয় করতো ওরা, তা শুধু অভিনয়ই। আবার কখনো মনে হ'ত দ্বিজেনবাবুকেই হয়তো ভালবাসতো নীলিমা, কোন কারণে বিয়ে হয়নি, আর এই ব্যর্থতার জন্যেই শেষ পর্যন্ত……

আমি বললাম, নীলিমা দ্বিজেনবাবুকে ভালবাসতো এমন সন্দেহ হওয়ার পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ ছিল!

প্রশান্ত বললে, একদিন নীলিমা কি যেন সেলাই করছিল, ঠাট্টা ক'রে বলে-ছিলাম, কি কাঁথা সেলাই করছো? শুনে, ও বললে, বেশ করছি, আইবুড়ো ছেলেদের মত কি মনে মনে মালা গাঁথবো নাকি বছরের পর বছর? আমি বললাম, কি অসীম ধৈর্য বলো আমাদের?

সলিল বললে, কথাটা বলা উচিত হয়নি তোর।

প্রশান্ত বললে, উচিত যে হয়নি-তা ব্রজর কথা শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম। সেদিন আমার এ কথা শুনে ব্রজ হঠাৎ ব'লে উঠলো, হ্যাঁ মেয়েদের অত ধৈর্য নেই, যাকে সাম্‌নে পায় পরিয়ে দেয়। ব'লে নীলিমার দিকে কটাক্ষ ক'রে হেসেছিল, ও আর নীলিমা চটে উঠে গিয়েছিল সেখান থেকে।

আমি বললাম, এ রকম ঠাট্টা স্বামীস্ত্রীর মধ্যে হামেশাই হয়

সলিল বললে, ঠাট্টার পিছনে সত্যিকার কিছু না থাকলে সেটা ঠাট্টা, কিন্তু……

প্রশান্ত বললে, ওটা যে শুধু ঠাট্টা নয় সন্দেহ হয়েছিল নীলিমা আত্মহত্যা করার অনেক পরে, যেদিন ব্রজর মা গল্পের ছলেই হঠাৎ জানালেন যে আসলে কুড়ি বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল নীলিমার অথচ নীলিমার বাবা যে কুষ্ঠী দেখিয়ে রাজযোটক করিয়েছিলেন তাতে বয়স ছিল আঠারো।

সলিল বললে, পথে এসো!

প্রশান্ত বললে, সন্দেহ আমাদের ক্রমশই বাড়ছিলো। মনে পড়লো, দশ-দিনের মধ্যে বিয়ে ঠিক হয়েছিলো ব্রজর, এক মাস পিছিয়ে দিতে রাজি হ'ননি নীলিমার বাবা, বলেছিলেন তা হ'লে অন্য জায়গায় বিয়ের চেষ্টা করি। অথচ ব্রজ তখন নীলিমার রূপে ভুলেছে, হাতছাড়া করতে রাজী নয়।

আমি বললাম, বাংলাদেশে এমন ঘটনা খুব কমই ঘটে।

প্রশান্ত বললে, কিন্তু ঘটে। শোনা কথা নয়, ব্রজর সঙ্গে মেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম আমিও।

সলিল বললে, ভালো লোক সঙ্গে নিয়েছিল ব্রজ।

প্রশান্ত বললে, এই বাচ্চা, একাপ ডব্‌লাফ।

তারপর হেসে বললে, চোর পালালে বুদ্ধি সকলেরই বাড়ে। কিন্তু এর জন্যে অনুশোচনাও আমার কম হয়নি।

আমি বললাম, তা হ'লে ব্রজকে ভালবাসতে পারেনি ব'লেই নীলিমা আত্মহত্যা করেছিল, এই তো?

প্রশান্ত বললে, ঠিক তার উল্টো।

সলিল বললে, হতেই পারে না।

—প্রথম প্রথম আমারও তাই মনে হয়েছিল। বিশেষ ক'রে মেয়ে দেখতে যাওয়ার দিন যা কিছু রহস্যজনক মনে হয়েছিল সেইগুলোই জুড়ে জুড়ে আত্মহত্যার কারণ খুঁজছিলাম যখন।

বললাম, আবার কি রহস্য?

প্রশান্ত বললে, সারাটা পথ সেদিন অস্বস্তিতে কেটেছিল ব্রজর। ট্রেনের জানালায় মুখ রেখে চুপচাপ্ বসেছিল, একটাও কথা বলেনি। তারপর ষ্টেশনে

পৌছলাম যখন, নীলিমার বাবা এসে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন। কিন্তু কেমন যেন লুকিয়ে লুকিয়ে ..

সলিল বললে, সে কি ?

প্রশান্ত হাসলে !—তখন কি ছাই বুঝতে পেরেছি ? সন্দেহ হয়েছে লোকটাই বুঝি বা অদ্ভুত প্রকৃতির। রাস্তায় তাঁর চেনাজানা লোকদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তারা জিজ্ঞেস করেছে আমাদের পরিচয়, আর আমাদের সাম্‌নেই তিনি বলেছেন, আত্মীয় হয়, বেড়াতে এসেছে। মেয়ে দেখতে এসেছি সে কথা বলেননি।

আমি বললাম, অনেকেই বলে না। মেয়ে দেখতে এলেই যে পছন্দ হবে এমন তো কোন কথা নেই।

প্রশান্ত বললে, তা নয়। সেখানকার কোন লোকের সঙ্গে কথাও বলতে দেননি আমাদের। ডেকে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছেন একেবারে অন্দরমহলে।

—তারপর ?

—তারপর, মেয়ে দেখে আমাদের দু'জনেরই খুব পছন্দ। হঠাৎ ব্রজ দুম ক'রে ব'লে বসলো, মেয়ের সঙ্গে ওর কয়েকটা কথা আছে, কেউ কাছে থাকলে চলবে না।

বললাম, রাজী হ'ল নীলিমার বাবা ?

প্রশান্ত বললে, কন্যাদায় কি বস্তু যখন বুঝবি তখন তুইও অনেক কিছু করতে রাজী হবি।

সলিল বললে, আমাদের পাশের বাড়ীতে দেখেছি বিয়ের আগে হবু জামাই এক সপ্তাহ জামাই আদরে থেকে গেছে, এবং সে সময় মেয়েকে বাপ-মা ছেড়ে দিয়েছে একেবারে বে-বন্ধা।

আমি বললাম, রাখ্‌ তোর পাশের বাড়ী। প্রশান্তকে জিগ্যেস করলাম, কি হ'ল তারপর ?

প্রশান্ত বললে, আমরা সবাই বেরিয়ে এলাম, মিনিট পাঁচকে ওরা দু'জনে কি সব বলাবলি করলো। তারপর ব্রজর ডাক শুনে ঘরে ঢুকতেই দেখি নীলিমা বেরিয়ে যাচ্ছে, আর ওর দু'চোখের নীচে কান্নার ছাপ।

—কান্না ? কিছু……

প্রশান্ত বললে, ব্রজকে জিজ্ঞেস করলাম সেদিন ফেরার পথে, কিন্তু ও শুধু

হেসেছিল,' উত্তর দেয়নি। আর নীলিমার বাবা যখন শুনলেন মেয়ে পছন্দ করেছে, দশ দিনের মধ্যেই বিয়ে ঠিক ক'রে ফেললেন।

বললাম, এত তাড়াহুড়ো যখন, নিশ্চয়ই কিছু গলদ ছিল

প্রশান্ত বললে, গলদ তো ছিলই। তাই নীলিমা আত্মহত্যা করার পর যখন দেখলাম ব্রজ কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে, আমাদের এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে, তখন একদিন ওর মাকে গিয়ে বললাম, ব্রজর আবার বিয়ে দিন মাসীমা।

—ব্রজর মা কি বললেন? জিগ্যেস করলাম।

—অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে মাসীমা হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বৌমা কেন যে এমন করলো বাবা! অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় কেউ আত্মঘাতী হয়?

আমি বললাম, নীলিমা অন্তঃসত্ত্বা ছিল?

সলিল বললে, এ-কথা আগে বলতে হয়!

প্রশান্ত বললে, আমরাও তাই ভেবেছিলাম। স্বামীর মনে সন্দেহ থাকলে স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করা তো অসম্ভব নয়। হয়তো আমার মতই ব্রজও প্রথমটা কিছু সন্দেহ করেনি, কিন্তু বিয়ের পর হয়তো……

সলিল বললে, প্রেমের সবচেয়ে বড়ো শত্রু সন্দেহ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন কিছু গোপন, কোন লুকোচুরি না থাকলে তবেই তারা সুখী হতে পারে।

প্রশান্ত বললে, ঠিক্ তার উল্টো। নীলিমা আত্মহত্যা ক'রেই সেটা প্রমাণ ক'রে গেছে।

—কি ক'রে জানলি?

—ব্রজ নিজেই বলেছিল একদিন। প্রশান্ত বললে।

—কি বলেছিল? প্রশ্ন করলাম।

প্রশান্ত বললে, আমাদের আড্ডাতে ব্রজ একেবারেই আসতো না। আমরাও প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম ওকে। তারপর হঠাৎ একদিন এসে হাজির হ'ল। বললে, এতদিন তোদের কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম, এখন বাড়ী থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। তা আমি বললাম, আবার বিয়ে কর ব্রজ, নীলিমার জন্যে নিজের জীবনটাও নষ্ট করবি?

—ও কি বললে? আমি জিগ্যেস করলাম।

প্রশান্ত বললে, শুনে হাসলো ও, হাসি তো নয়, যেন কান্না। তারপর

বললে, নীলিমা আত্মহত্যা ক'রে প্রমাণ ক'রে গেল যে ও আমাকে ভালবেসেছিল, আর সে-কথা ভুলে গিয়ে আবার বিয়ে করতে বলিস্‌ ?

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে প্রশান্ত বললে, আমি তো শুনে থ। বলে কি ছেলেটা, আত্মহত্যা ক'রে প্রমাণ ক'রে গেল ভালবাসতো ? বললাম, তোর কথাটা কেমন যেন রহস্য ঠেকছে। নীলিমা কেন আত্মহত্যা করেছে জানিস্‌ তুই ?

ব্রজ দুঃখের হাসি হেসে বললে, জানি।

—কেন বল তো ?

ব্রজ এ প্রশ্ন শুনে বললে, তখন ভাবতাম ক্ষমা করাটাই মানুষের সবচেয়ে মহৎ গুণ, কিন্তু ক্ষমা করলেই তো আর মেয়েদের মন থেকে আত্মগ্লানি মুছে যায় না। তারপর হঠাৎ যেন ভেঙে পড়লো ব্রজ, বললে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন কিছু গোপন না রাখাই নাকি প্রেমের চূড়ান্ত নিদর্শন ! সব ভুল, বুঝলি প্রশান্ত ! সোনায় যেমন খানিকটা খাদ মেশাতে হয় তেমনি প্রেমেও খানিকটা মিথ্যে থাকা দরকার।

প্রশান্ত চুপ করলে।

আমি বললাম, কথাটা ব্রজ নেহাৎ মিথ্যে বলেনি।

প্রশান্ত বললে, ব্রজর কাছ থেকেই সেদিন আসল কারণটা শুনেছিলাম। ও বলেছিল, প্রশান্ত, ভুল করেছি আমি, জানতাম না নীলিমা যত বেশি ভালবাসবে আমাকে ততই নিজেকে ঘৃণা করবে ও। আমি বললাম, তা কি ক'রে সম্ভব ? শুনে ব্রজ বললে, আমি প্রথম ভুল করেছিলাম ব'লেই নীলিমার ভালবাসা পেয়েছিলাম, আর নীলিমা ভালোবেসেছিল ব'লেই আত্মগ্লানি মুছে ফেলতে পারেনি।

প্রশান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেললে।—ব্রজ তখন যেন সব কথা খুলে বলতে পারলে বাঁচে। বললে, এত তাড়াহুড়ো ক'রে বিয়ে, তা ছাড়া নীলিমার বাবার ওভাবে আমাদের আগলে আগলে বাড়ী নিয়ে যাওয়া—এ সবের কোন দরকারই ছিল না।

—কেন বলতো ? আমি জিগ্যেস করেছিলাম। প্রশান্ত বললে।

তা শুনে ব্রজ বললে, নীলিমার সঙ্গে একা দেখা করতে চেয়ে কি বলেছিলাম জানিস্‌ ? শুধু একটি প্রশ্ন। জিগ্যেস করেছিলাম, আমি সব জানি, তা সত্ত্বেও তুমি আমাকে বিয়ে করতে পারবে ?

প্রথমটা হু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল নীলিমার। অনেকক্ষণ পরে বলেছিল, পারবো। শুধু একটি কথা : পারবো। অথচ ও তো তখন বোঝেনি কত বড়ো ভুলের মধ্যে পা বাড়ালো ও।

বোকা মেয়ে। ও জানতো না ওর চোখে একদিন স্বামীই নয়, প্রেমিক হয়ে উঠবো আমি, কোনদিন ও আমাকে ভালবেসে ফেলবে! ব'লে হেসেছিল ব্রজ। হাসি তো নয় যেন কান্না।

সলিল বললে, আশ্চর্য! ব্রজ সবই জানতো তা হ'লে?

প্রশান্ত বললে, জানতো আর জেনেও বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল ব'লেই ভালবেসেছিল নীলিমা। ভালবাসাই নয়, শ্রদ্ধাও!

আমি বললাম, আর এই মানুষ চোখের জল মুছে দ্বিতীয়বার বিয়ে করলে?

প্রশান্ত বললে, হ্যাঁ, নীলিমার বোনকে। দ্বিজেনবাবুর সঙ্গে মাসখানেক কোথায় চলে গিয়েছিল ব'লে কিছুতেই বিয়ে হচ্ছিল না কিনা।

হঠাৎ ভীষণ শব্দ ক'রে সামনের রাস্তায় একটা লরী ব্রেক কষলো। একটা ট্যাক্সির সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে।

কি হয়েছে দেখবার জন্তে প্রশান্ত ছুটে বেরিয়ে গেল। ফিরে এসে বললে, ও কিছু না, অ্যাকসিডেণ্ট!

উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলাম, কোন্‌টা!

প্রশান্ত বললে, প্রেম এবং আত্মহত্যা, হুটোই জীবনের বিচিত্র অ্যাকসিডেণ্ট।

সুখের স্বাদ

আজ ঘড়ির কাঁটা সব ঘর ঘুরে এসে যখন সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকারকে ক্রমশ নিস্তব্ধ রাত্রির কোলে তুলে দেবার জন্তে তৈরী হবে, দূরের বা দেওয়ালের কোন ঘড়ি যখন একটি নিঃসঙ্গ ঘণ্টাধ্বনি বাজিয়ে জানিয়ে দেবে যে, এখন রাত ঠিক আটটা তিরিশ মিনিট, তখনই নিরুপমা—নিরুদির কথা মনে পড়বে।

হয়তো চেনেন না, হয়তো বা নাম জানেন না তাঁর, কিন্তু নিরুদিকে আপনারাও কখনো না কখনো দেখে থাকবেন। ঠিক এই মুহূর্তটিতে নিরুদি কোন না কোন সিনেমা হলের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, সিনেমা হাউসের প্রাঙ্গনে ঘোরাফেরা করছেন, কিংবা দেখছেন দেয়ালের কাঁচে ঢাকা ছবিগুলো।

বেলেঘাটার একটা দরিদ্র গলিতে পাশাপাশি থাকতাম আমরা। ভাড়া ছিল সমানই, কিন্তু আমাদের ঘর ছিল দু'খানা, আর নিরুদির দেড়খানা। জলঘর ছিল একটাই, এক ফালি বারান্দার মাঝখানে কোমর উঁচু দেওয়ালের পার্টিশন দিয়ে বানানো হয়েছিল দু'তরফের রান্নাঘর।

এত কাছাকাছি ছিলাম ব'লেই ঘনিষ্ঠতা হতে দেরী হয়নি। দুপুরে হঠাৎ কোন আত্মীয় অতিথি এসে হাজির হ'লে নিরুদি পাঠিয়ে দিতেন দু'একটা ঝাল ঝোল তরকারী, আর তাঁর বাড়ীতে লোক এলে বিনা দ্বিধায় চেয়ে নিয়ে যেতেন আমাদের রেকাবীখানা, চা দেবার জন্তে কাঁচের গ্লাস, কিংবা হঠাৎ প্রয়োজনে দু'চামচ চিনি।

এমন মিশুকে মানুষ খুব কমই দেখেছি। সব সময়েই মুখে একটা হাসিখুসী ভাব, আর কথা। কথার যেন আর শেষ নেই। আলাপ সুরু করলে আর শেষ হ'ত না, যতক্ষণ না ডাল পুড়ে যাওয়ার গন্ধ নাকে আসে। আর সে গন্ধ নাকে এলেই ছুটে পালাতেন নিরুদি, কথা শেষ না ক'রেই। ঘামে

ভেজা মুখ, আধময়লা সাড়ীতে হলুদের ছোপ, হাতে হয়ত দাঁতি-সুপুরি, কিংবা কাপড়-কাচা সাবান, আর কাঁধে গামছা, নয়তো একরাশ ময়লা কাপড়। কিন্তু সন্ধ্যে হতে না হতেই নিরুদির নিজের চেহারাও বদলে যেত, যেমন বদলে যেত তাঁর দেড়খানা ঘরের চেহারা। তকতকে পরিষ্কার চাদর পড়তো বিছানার ওপর, মেঝের ভাঙ্গা পুরানো সিমেণ্টও পরিচ্ছন্ন দেখাতো, আর নিরুদি নিজেকেও সাজাতেন পরিপাটিভাবে। দু'খানাই রঙিন সাড়ী পাণ্টাপাণ্টি ক'রে পরতেন, খোঁপায় গুঁজতেন ঘুঙুর-বাঁধা রূপো-রঙের কাঁটা, কপালে সিঁদুরের বড়ো একটা টিপ, পাতলা আর ফর্সা ঠোঁটে পানের ছোপ। নিরুদিকে তখন রীতিমত সুন্দরী মনে হ'ত। শুধু সে রূপের আড়াল থেকে উঁকি দিত লুকানো দারিদ্র্য, গোপন কি একটা ব্যর্থতা।

অরুণাকে প্রায়ই বলতাম সে কথা। বলতাম, নিরুদির জন্যে সত্যি দুঃখ হয় মাঝে মাঝে।

মেঘ-থমথম মুখ ক'রে ও বলতো, অপরের বৌয়ের জন্যে তোমার যত দুঃখ তার এক আনাও যদি নিজের বৌয়ের জন্যে থাকতো।

রাগাবার জন্যে বলতাম, অত অভাবের মধ্যেও কেমন হাসিখুশী থাকেন নিরুদি, কেমন সাজানো গোছানো সংসার। কথায় কথায় তো আর ঠোঁট ফোলায় না তোমার মত।

রাগে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অরুণা বলতো, ছাই সাজানো গোছানো। সংসারের ওপর কি ওর কোন টান আছে নাকি, না স্বামীর ওপরেই আছে।

বলতাম, সন্ধ্যে হ'লেই যে জানালায় দাঁড়িয়ে স্বামীর পথ চেয়ে থাকে তার আবার টান নেই স্বামীর ওপর?

অরুণা হাসতো।—বাইরে থেকে তোমরা কতটুকুই বা বোঝ। নিরুদির টান যদি কিছুর ওপর থাকে তো সে হ'ল সিনেমার ওপর।

কথাটা অরুণা বললেও মানতে বাধ্য হতাম। খানিকটা সন্দেহ আর অবিশ্বাসও উঁকি দিতো মনের মধ্যে। সত্যি কথা বলতে কি, নিরুদির সঙ্গে কথা ব'লে যত ভাল লাগতো, তত খারাপ লাগতো তাঁর স্বামী বেচারীর অবস্থা দেখে। কোন একটা ছোট্ট আপিসে কাজ করতেন মৃন্ময়বাবু, মাইনে পেতেন কম, কিন্তু অত অল্প টাকা রোজগারেও তো আর পাঁচটা লোক বছরে একজোড়া নতুন জুতো কিনতে পারে, পুজোর সময় দুটো জামা

বানায়। মৃন্ময়বাবুর চেহারা দেখলেই দুঃখ হ'ত নিরুদির জন্যে, কিন্তু অরুণা বলতো আসলে দুঃখ হওয়া উচিত মৃন্ময়বাবুর জন্যেই।

ভদ্রলোক যখন আপিসে বেরুতেন, তখন কোষ্ঠীর বয়সের চেয়ে পাঁচ বছর বেশী মনে হ'ত, আর ফিরতেন যখন তখন মনে হ'ত পঁয়ত্রিশ বছরেই নুয়ে পড়েছেন। নিরুদি ফিটফাট থাকতে ভালবাসেন বটে, কিন্তু তার স্বামীকে পরিষ্কার কাপড় পরতে দেখতাম কদাচিৎ। পায়ে ছেঁড়া জুতো, হাতে তালিমারা ছাতা, গায়ে একটা মান্ধাতা আমলের গলাবন্ধ কোট। কোটের নীচে হয়তো একটা গেঞ্জি পরতেন, কিংবা তাও পরতেন না মৃন্ময়বাবু।

অরুণা যখন নিরুদির সম্পর্কে অনুযোগ করতো, বলতাম মৃন্ময়বাবুর চেয়ে তিরিশ টাকা বেশী রোজগার ক'রেও আমাদের অবস্থা তো দেখছো। কি ক'রে চালাবেন বলো।

অরুণা রেগে যেতো একথা শুনে। বলতো, তোমাকে আর ওকালতি করতে হবে না নিরুদির হয়ে। মাসে পনেরো দিন সিনেমা দেখতে পারে আর স্বামীর জন্যে একজোড়া জুতো কেনার পয়সা হয় না।

কথাটা সত্যি। আর ওই একটাই দোষ দেখতে পেতাম নিরুদির। মাঝে মাঝে খুব খারাপও লাগতো।

নিরুদি যে এত এত কথা বলতেন, এত এত হাসি, সবই কিন্তু ঐ একটি জিনিসকে কেন্দ্র ক'রে। সিনেমা।

শুধু অরুণাই নয়, পাশাপাশি বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরাও নিরুদির এই বাড়াবাড়িটা ভালো চোখে দেখতে পারতো না। প্রায়ই চোখে পড়তো আটটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে সেজেগুজে বেরিয়ে যাচ্ছেন নিরুদি। সঙ্গে মৃন্ময়বাবুই যেতেন কিন্তু পাশাপাশি ওদের দেখে কেউই স্বামী স্ত্রী ব'লে মনে করতো না। সাজ-পোষাকে এত তফাৎ।

যখন ফিরতেন টের পেতাম না কোনদিন, কোনদিন বা শুনতাম খিল-খিল হাসি বা কোন অভিনেতা সম্বন্ধে আলোচনা, যে আলোচনায় মৃন্ময়বাবু যোগ দিতেন না কিংবা তার মৌনতাই ছিল যোগাযোগ। সকাল হতে না হতেই নিরুদি একমুখ হাসি নিয়ে হাজির হতেন, হাতে কোন একটা নতুন ছবির বই, যে-বইগুলো সিনেমার হলে বিক্রী হয়।

পাৎলা বারো পাতার চটি বইখানা এগিয়ে দিয়ে নিরুদি জিগ্যেস করতেন,

দেখেছেন এ ছবিটা? তারপর উত্তর শোনার অপেক্ষা না ক'রেই বলতেন, দেখে এলাম কাল রাত্তিরে। কি চমৎকার যে হয়েছে, যান না অরুণাকে নিয়ে। দেখে আসুন।

পেছন থেকে টিপ্পনি কাটতো অরুণা।—ভালো লোককেই বলেছেন নিরুদি। উনি নিয়ে যাবেন সিনেমায়, তার আগে সাতবার হিসেবের খাতা নিয়ে বসবেন।

হিসেবের খাতা নিয়ে যে কেন বসতে হয়, নিরুদির মত রোজ রোজ সিনেমা যাওয়া যে কেন পোষায় না তা অরুণা জানতো। তবু বুঝতাম, অরুণার মনেও এমন দু-একটা সাধ জাগে। তাই, সম্ভব হ'লে দু-মাসে ছ-মাসে সিনেমা দেখতে যেতাম আমরাও।

নিরুদি কিন্তু দেখে এসেই সন্তুষ্ট হতেন না। এসে দেখাতেন দু'আনা দামের সিনেমার বইটা, গল্পটা ব'লে যেতেন, বলতেন কে কেমন অভিনয় করেছে, কোন্ গানটা ভালো, পেছনের কোন্ অভদ্র লোকটা ওর কাঁধে হাত ঠেকিয়েছিল। শরীর দুলিয়ে হেসে নেচে অভিনয় ক'রে সব ছবিটুকুই ফুটিয়ে তুলতেন নিরুদি। তারপর এক সময় বইটা টুক্ ক'রে তুলে নিয়ে চলে যেতেন পড়শির অন্য কোন বাড়ীতে।

অরুণা বলতো, আশ্চর্য মানুষ বাপু, একটা দিন সিনেমা না দেখে স্বামীর একটা ধুতি কিনলেও তো পারে।

পাশের বাড়ীর হরেনবাবুও এসে অনুযোগ করতেন।

—আপনাদের ঐ নিরুদিটাকে না তাড়াতে পারলে তো নিস্তার নেই মশাই। নিজে যা ক'রে করুক, আমাদের বাড়ীর মেয়েগুলোকেও নাচাতে ছাড়ে না।

বলতাম, হ্যাঁ, ওর ঐ এক দোষ।

—দোষ? রেগে যেতেন হরেনবাবু, বলতেন, চাকরী বাকরী তো মশাই আমরাও করি। মাসে একটা সিনেমা দেখলেই তো টানাটানি পড়ে যায়। টাকা পায় কোত্থেকে বলুন তো?

ইঙ্গিতটা কিন্তু খারাপ লাগতো। নিরুদি স্বামীর দিকে চোখ দেন না, একথা সত্যি হতে পারে, কিন্তু নিজের দিকেই বা চোখ আছে কই? সেই দু-খানা রঙিন সাড়ীই তো পাল্টাপাল্টি ক'রে পরেন। একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন

থাকা স্বভাব ওঁর, এই যা। কিন্তু সেটা মানুষের পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার, অপরাধ নয় নিশ্চয়ই। আর জীবনের কোন সাধই যার মেটেনি, একটা নেশায় সে যদি নিজেকে ভুলে থাকতে পারে, কি এমন দোষ!

অরুণাকেও সে কথা বোঝাতাম। বলতাম, তোমাদের সময় কাটে ছেলে মানুষ করতেই; নিরুদির সময় কাটাবার কেউ নেই ব'লেই ছেলেমানুষ থেকে গেছেন।

অরুণা বলতো, মৃন্ময়বাবুও তো একটা ভাইকে মানুষ করছেন, ইস্কুলে পড়াচ্ছেন। উনি পারেন কি ক'রে ঐ টাকায়?

বলতাম, চেষ্টা করলে কি আর না হয়?

অরুণা হেসে ফেলতো।—সেই কথাই তো বলছি, তুমিও কি চেষ্টা করলে পারো না? ইচ্ছে নেই এই যা!

সুতরাং ইচ্ছে করতে হ'ত কখনোসখনো। আর সেইজন্তেই একটা নতুন ছবি দেখতে গিয়ে হঠাৎ দেখা হয়েছিল সেদিন নিরুদির সঙ্গে।

তখন সাড়ে আটটার ঘণ্টা বেজে গেছে। একটা শো শেষ হবার মুখে আর পরের শো সুরু হবার আগেই লোক জমতে সুরু করেছে।

একেবারে আনকোরা নতুন একটা ছবি দেখানো হচ্ছে সেদিন থেকেই। তাই এসেই দেখলাম টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে সব।

অরুণা বললে, চলো, অন্য ছবি দেখিগে।

বললাম, তাই চলো।

টিকিট ঘরের সামনে থেকে বেরিয়ে আসছি, হঠাৎ চোখ পড়লো মৃন্ময়বাবুর দিকে। এক কোণে ছাতায় ভর দিয়ে চুপচাপ স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে আছেন, ভ্রূক্ষেপ নেই কোনদিকে।

মৃন্ময়বাবুকে দেখেই বুঝলাম, নিরুদিও নিশ্চয় আছেন কাছেপিঠে। আর তাই রঙ-ঝলমল মেয়েদের মুখের ওপর দিয়ে, শরীরের নয় একথাই বা বলি কি ক'রে, আমার চোখ পিছলে পিছলে গিয়ে থামলো নিরুদির মুখে। প্রজাপতির মত ছটফট ক'রে এখান থেকে ওখানে সরে সরে যাচ্ছিলেন নিরুদি। কিন্তু চোখ আঁটা ছিল তাঁর কাঁচে ঢাকা শো-কার্ডের ছবি-গুলোর ওপর। খুব তন্ময় হয়ে নিরুদি দেখছিলেন ছবিগুলো, কখনো সরে

যেতে গিয়ে অন্ত মেয়ের ধাক্কা লাগছিল হয়তো, আর একমুখ হাসি ছড়িয়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছিলেন নিরুদি। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়, রীতিমত কথা জুড়ে দিচ্ছিলেন তাঁর সঙ্গে। কি যেন দেখাচ্ছিলেন ছবিগুলোর দিকে আঙুল তুলে, আর হাসছিলেন সেই সহজ খিল খিল হাসি।

অরুণারও এতক্ষণে চোখ পড়েছিল।—আরে নিরুদি যে। ব'লেই এগিয়ে গেল ও।

আমিও এগিয়ে যেতে বাধ্য হলাম।

অরুণা বললে, কেমন ভাগ্য দেখেছেন নিরুদি। এলাম একদিন, তাও টিকিট পেলাম না। আপনারা পেয়েছেন?

নিরুদি প্রথমটা একটু বিরক্ত হয়েছিলেন বোধ হয়। কিন্তু পরমুহূর্তেই হেসে উঠলেন।

বললেন, টিকিট কি ভাই পাওয়া যেতো। ঠিক মুহূর্তে এসে পড়েছিলাম তাই, তিন টাকার টিকিট মাত্র দু'খানাই ছিল।

—তিন টাকা!

শুধু অরুণাই নয়, আমার মুখ থেকেও বোধ হয় অস্ফুট বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছিল। তাই লজ্জা চাপা দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি অরুণাকে বললাম, চলো শীগ্‌গির, অন্য ছবি দেখতে হয় তো।

চলে এলাম তখনই। দেখে এলাম অন্য একটা ছবি। কিন্তু নিরুদির কাছে শোনার পর থেকে অরুণা জিদ ধরলো তিন টাকার টিকিটে একদিন সিনেমা দেখতে হবে। 'সুতরাং পুরো একমাসের জলখাবারের খরচটা সংক্ষেপ করতে হলো। ফলে নিরুদির ওপর চটে গেলাম, হরেনবাবুর ইঙ্গিতটাও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হ'ল।

নতুন একটা ছবি তখন চলছে, মাত্র দু'তিন দিন সুরু হয়েছে হয়তো। তাই অরুণা বললে, চলুন নিরুদি একসঙ্গে দেখে আসি।

নিরুদি হেসে বললেন, ও ছবিতো কবে দেখেছি, পরশু দিনই। ব'লে গল্পটা ব'লে গেলেন নিরুদি। তারপর নাক কুঁচকে বললেন, এমন বাজে ছবি দু'বার দেখতে আমার ভাল লাগে না।

এক ছবি একবারই যাদের দেখা হয় না, দুবার দেখার কথা তারা আর বলবে কি ক'রে।

তিন টাকার টিকিটে দেখার জন্যে কিনা জানি না, ছবিটা এত ভালো লাগলো যে মনে হ'ল নিরুদি ছু'বার দেখলেও পারতেন।

কিন্তু বাড়ী ফেরার পথে যখন মনে পড়লো করকরে ছ'টা টাকা বেরিয়ে গেছে তখন মন খারাপ হয়ে গেল রীতিমত।

আরো মন খারাপ হ'ল দিন কয়েক পরেই, যখন উচ্ছ্বসিত আনন্দে নিরুদি বললেন, শুনেছেন খবর ?

—কি খবর ? কৈ শুনিনি তো কিছু।

নিরুদি হাসি হাসি মুখে বললেন, ওঁর মাইনে বেড়েছে অনেক। চাকরীতে উন্নতি হ'ল।

আর নিরুদি চলে যেতেই অরুণা বললো, শুনছো খবর ?

—কি খবর ? মাইনে বাড়াতো ?

অরুণা ম্লানমুখে বললে, না। নিরুদি বলছিলেন ওঁরা এবার নাকি একটা ভালো বাড়ীতে উঠে যাবেন।

বললাম, তা তো যাবেনই। পাড়ার লোক তবু সন্তুষ্ট হবে।

ভাবলাম নিরুদির সম্বন্ধে যা তা শুনতেও হবে না আর হরেনবাবুর কাছ থেকে।

অরুণা কোন জবাব দিলো না। বুঝলাম এতদিন পাশাপাশি থেকে নিরুদির ওপর মায়া পড়ে গেছে ওর। ছেড়ে যাবেন শুনে তাই চোখ ছলছল করছে।

কিন্তু মৃন্ময়বাবুরও চোখ ছলছল করে তা জানতাম না। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হ'ত খুবই কম। একটু গম্ভীর নির্বিকার ধরণের মানুষ, তাই চুপচাপ দশটা-পাঁচটা করতেন, আর নেহাৎ দায়ে না পড়লে কথা বলতেন না কখনও।

সেই মৃন্ময়বাবুই হঠাৎ একদিন এসে হাজির হলেন। এসে বললেন একটা উপকার চাইতে এসেছি।

বললাম, উপকার করার সুযোগ আর ক'জন দেয়। বলুন, কি ব্যাপার !

মৃন্ময়বাবুর চোখ ছলছল ক'রে উঠলো। বললেন, আমার স্ত্রী আপনাদের কথা খুব মানে তাই বলছিলাম······

বললাম, বলুন সঙ্কোচ করবেন না। এতদিনেও যদি আমরা আত্মীয় না হয়ে থাকি তাহলে বুঝবো আমরা মানুষই নই।

মৃন্ময়বাবু বিষণ্ণ মুখে হাসবার চেষ্টা করলেন। বললেন, মেয়েদের সবচেয়ে বড়ো সাধ যা তা তো মিটলো না ওর। এত রকমের সখ ওর, কোনটাই মেটায়নি এতদিন, শুধু টাকা জমিয়েছে। ছেলেকে ভালভাবে মানুষ করবে, ভালো ইস্কুলে পড়াবে, ছেলের পোষাক দেখে কেউ যেন না ভাবে যে গরীবের ছেলে, এই সব স্বপ্ন দেখেছে বিয়ের পর থেকেই।

একটু থামলেন মৃন্ময়বাবু। দেখলাম, চোখে জল চেপে রাখতে পারছেন না ভদ্রলোক।

বললেন, সিনেমা দেখার এত সখ ওর, কিন্তু বিয়ের পর থেকে একটা ছবিও দেখতে রাজি হয়নি।

—সে কি ? আমিই বিস্মিত হ'লাম।

মৃন্ময়বাবু বললেন, ছবি তো দেখতো না ও। শুধু সিনেমা হলের সামনে ঘোরাঘুরি করতো। দেওয়ালের ছবিগুলো দেখতো। আর দু'আনা দিয়ে একখানা বই কিনে আনতো। ঐ যে বইগুলো সিনেমা হলে বিক্রী হয় সেগুলো।

স্তম্ভিত হয়ে রইলাম মৃন্ময়বাবুর কথা শুনে।

একটু থেমে চোখ মুছে মৃন্ময়বাবু বললেন, এখন তো মাইনে বেড়েছে, বলছি একদিন একটা সিনেমা দেখতে। কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। বলছে, তার চেয়ে ছেলের জন্তে টাকাটা জমিয়ে রাখবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করলেন মৃন্ময়বাবু।

বললাম, কি করতে হবে বলুন।

মৃন্ময়বাবুর হাসিটাও বিকৃত হয়ে গেলো কথা বলতে গিয়ে। বললেন, আপনার স্ত্রী যদি একটু বুঝিয়ে বলেন। এত সখ ওর সিনেমা দেখার, একটা দিন যদি সত্যিই দেখে আসে একটা ছবি। আট বছর তো হয়ে গেলো, আর ছেলের জন্তে টাকা জমিয়ে কি হবে বলুন ?

ভুলে ঘাড় নেড়ে ফেলেছিলাম। শুধরে নিয়ে বললাম, না না, সে কি কথা, সে কি কথা !

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম দু'জনে। তারপর এক সময়ে উঠে বিদায় নিয়েছিলেন মৃন্ময়বাবু।

অরুণা সব শুনে কপালে চোখ তুলেছিল। তারপর অনেক বুঝিয়েছিল নিরুদিকে।

—অন্তত একদিন সিনেমা দেখে আসুন নিরুদি, তা না হ'লে উনি দুঃখ পাবেন।

নিরুদি হেসে উঠেছিলেন। কিন্তু রাজি হ'ননি। তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে বেরিয়ে যেতেন আগের মতই, সিনেমার সেই চটি বই একখানা কিনে আনতেন। কিন্তু আগের মত অরুণার কাছে এসে গল্প করতেন না কোনদিন। সকাল হ'লেই বইটা হাতে নিয়ে চলে যেতেন হরেনবাবুদের বাড়ী।

তারপর একদিন সত্যিই ও-বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন নিরুদিরা। এখনও মাঝে মাঝে সিনেমা হলের সাম্‌নে ঘোরাফেরা করেন, দেওয়ালের ছবি দেখেন নিরুদি। কিন্তু সিনেমার টিকিট কাটেন না কোনদিন।

যে কোন রবিবারে রাত সাড়ে আটটার সময়ে খোঁজ করলে কোন না কোন সিনেমা হলের সাম্‌নে আপনারাও নিরুদির দেখা পাবেন, দেখবেন হয়তো দেওয়ালের ছবিগুলো দেখছেন নিরুদি, হাতে দু'আনা দামের একখানা চটি বই, আর হয়তো একটু পরেই দেখবেন কোন না কোন মেয়ের সঙ্গে আলাপ জুড়ে নিরুদি জেনে নিচ্ছেন কে কেমন অভিনয় করেছে, কোন্ গানটা ভালো, ছবির শেষটা কি রকম।

সতী ঠাকরুনের চিতা

গল্পে রস মিলবে না হয়তো, কিন্তু গল্পের চেয়েও চমকপ্রদ এই যশাই পণ্ডিতের উপাখ্যান।

জেলা বাঁকুড়া, মহকুমা বিষ্ণুপুর, বিষ্ণুপুর থেকে সাত ক্রোশ পূবে ময়নাপুর কাঁসারীদের গ্রাম। গ্রামের এদিকে একখানা ভাঙ্গা পুরোনো বাড়ী, লোকের মুখে—দেওয়ানজীর কাছারী। আশেপাশে আরও কয়েক ঘর বামুন-কায়েতের বাস থাকলেও কিন্তু গাঁয়ের আর সবাই ডোম।

সে কি আজকের কথা! অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে যেদিন দেশে ফিরলেন, ময়না-পুরের লোক তখন বিষ্ণুপুরকে বলতো সহর, বাঁকুড়া ছিল বিদেশ।

বিষ্ণুপুরে একটা মশলাপাতির দোকান ছিল অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যের, বেশ কিছু টাকা লোকসান দিয়ে গ্রামে ফিরলেন তিনি।

ফিরে এসে দেখলেন, বদলে গেছে সব রাতারাতি। ডোমপল্লীর নাম হয়েছে পণ্ডিতপাড়া।

কি ব্যাপার! ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়। ডোমপল্লীর যশাই সিদ্ধপুরুষ হয়েছে। পণ্ডিত হয়েছে। লোকে তাকে সসম্মানে যশাই পণ্ডিত বলছে।

শুনে প্রথমটা হেসেছিলেন অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে। হাসি পাবারই কথা। ডোমের ছেলে হয়েছে পূজোরীঠাকুর। কালে কালে কতই দেখতে হবে। সারা দেশটা যে উচ্ছন্নে যাচ্ছে তা অনেক আগেই টের পেয়েছিলেন তিনি। ধর্ম কর্ম আর রইল না বোধ হয়, সব খ্রীষ্টান হয়ে গেল। তা না হ'লে অমন যে বাপঠাকুর্দার জমাট ব্যবসা, তাও কিনা অচল হ'ল। মেথর মুদ্দোফারাসে ছোঁয়াছুঁয়ি হ'য়ে জাহাজে ক'রে মশলাপাতি এনে বাজারে ঢেলে দিলো সাহেব কোম্পানীর লোক, আর তাই কিনা দু'পয়সা দর সস্তার লোভে হুমড়ি খেয়ে কিনলো সকলে।

ক্ষোভের সীমা ছিল না অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যের। ময়নাপুরে ফিরে দেখলেন গাঁয়ের মানুষের গায়েও সেই হাওয়া লেগেছে।

চারপাশে মাটির দেওয়াল তুলে খড়ের চালা দেওয়া ছোট্ট একখানা ঘর—তাই নাকি যশাই পণ্ডিতের মণ্ডপ। ধর্মঠাকুরের নাম বাঁকুড়া রায়।

যেমন পূজোরী তেমনি দেবতা। তা হোক, কিন্তু বামুন কায়েতগুলোও গিয়ে ভিড় করে কোন্ লজ্জায়?

কেন, গাঁয়ে যখন মড়ক নামলো তখন কোথায় ছিলেন বাঁড়ুজ্যেমশাই? কে থামালো সেই মড়ক? শিবেন মিস্ত্রির মেয়েকে সেবার গোখরোয় কাটলো, কে বিষ ঝাড়লে? দু'দিনের জ্বরে যখন সদাশিব মুখুজ্যের বড়ো ছেলে ধড়ফড় ক'রে মরলো, শ্মশানে গিয়ে সারারাত মন্ত্র পড়ে যশাই পণ্ডিতই না বাঁচিয়ে তুললো তাকে? অনন্ত হাজরার বুড়ি দিদিমার আঠারো বছরের বাত এক কলি শিকড় দিয়ে সারায়নি যশাই পণ্ডিত?

শুনে মনে মনে চটতেন অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে, মুখে বিদ্রূপের হাসি হাসতেন।

—নির্বোধ কুসংস্কারাক্রান্ত মূর্খের দল সব। মনে মনে বলতেন আর নিজের আত্মাভিমানের গায়ে প্রবোধ বুলোতেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর থাকতে পারলেন না চুপ ক'রে, তাঁর নিজের সংসারও কলঙ্কিত হ'তে চলেছে, অথচ কোনদিন সন্দেহ হয়নি তাঁর?

অক্ষয় তৃতীয়ার রাত্রে হঠাৎ কি একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে এসে দাওয়ায় বসলেন হুঁকো হাতে।

গৃহিণীকে ডাকলেন দু'বার, সাড়া পেলেন না। বোধ হয় ছেলেমেয়েদের নিয়ে হয়তো পাশের ঘরে ঘুমিয়ে আছে, ভাবলেন। তাই নিজেই নিভন্ত উনোন থেকে আগুন তুলে টিকে ধরালেন কোন রকমে।

তারপর দাওয়ায় বসে অন্ধকার মাঠের দিকে চোখ মেলে বসে রইলেন।

ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ—ডুগি বাজছে যশাই পণ্ডিতের আখড়ায়। একটা লোলিহান শিখা দুলে দুলে উঠছে।

নতুন কোন ভণ্ডামি শুরু করেছে ডোমের ছেলেটা, ভাবলেন অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে।

সামনের পুকুরের দিকে চোখ গেল। ওদিকের ঘাটে এক সারি মেয়ে স্নান করতে নেমেছে নাকি এত রাত্তিরে?

যে দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা ক'রে রইলেন। হ্যাঁ, সাদা ফুটফুটে কাপড়টাই শুধু দেখা যাচ্ছিল। কারা যেন এগিয়ে আসছে তাঁর দিকেই।

—কে? ক্রোধের স্বরে প্রায় চীৎকার ক'রে উঠলেন।

যারা আসছিল হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো তারা। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো একসময়। কোন কথা না ব'লে মাথা হেঁট ক'রে ঢুকলো তারা।

—কল্যাণী!

আবার চীৎকার ক'রে ডাকলেন অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে।

মাথা হেঁট ক'রে সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো বড় মেয়ে কল্যাণী।

—কোথায় গিয়েছিলে এত রাতে?

মৃদু স্বরের উত্তর এলো, পণ্ডিতের মন্দিরে।

—পণ্ডিত? ক্ষিপ্তস্বরে চীৎকার ক'রে উঠলেন অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে।—শালা ডোম, ভেল্কি দেখিয়ে পণ্ডিত হয়েছে! আমার অনুমতি না নিয়ে আর কোন দিন যাবে না, তোমায় এই ব'লে দিলাম শেষবারের মত।

—যাবো না আর। মৃদু উত্তর এলো।

কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি ভুলতে সময় লাগলো না কল্যাণীর। তা না হ'লে সারা গাঁয়ে এত কানাঘুষো চললো কেন, ডোমপল্লীতে হাসির হুল্লোড় উঠলো কেন কল্যাণীর নামে!

সকলেই প্রথম প্রথম লক্ষ্য করতো, সকালে পূজোয় বসতে দেরী হয়ে যেতো যশাই পণ্ডিতের। কোষাকুষি ধুয়ে ফুল-বেলপাতা নেড়ে সময় কাটাতো কেবল। তারপর একসময় স্নান সেরে এলোচুলে এসে হাজির হ'ত কল্যাণী। সমস্ত শরীরে যৌবনের পুষ্প ফুটিয়ে, মুখে মুক্তোর হাসি দুলিয়ে এসে বসতো কল্যাণী, পূজোর উপকরণ সাজিয়ে দিতো।

ধর্মঠাকুর বাঁকুড়া রায়ের পূজোয় বসতো তখন যশাই পণ্ডিত, উচ্চ গম্ভীর স্বরে মন্ত্রপাঠ শুরু করতো।

বাঁকুড়া রায়ের মূর্তির পায়ে একটি জবাফুল রেখে মন্ত্রপাঠ চলতো, যতক্ষণ না সেটি নীচের ঘটের মুখে এসে পড়ে মন্ত্রের শক্তিতে।

জবাফুলটি ঘটের জলে ছিটকে এসে পড়লে তবেই পূজো সাঙ্গ হ'ত, শান্তিজল বিতরণ করতো যশাই পণ্ডিত।

যেদিন কল্যাণী আসতো না সেদিন জবাফুল বাঁকুড়া রায়ের চরণেই থাকতো, কিছুতেই ঘটের মুখে এসে পড়তো না।

যশাই পণ্ডিত বলতো, ধর্মঠাকুর অসন্তুষ্ট হয়েছেন, কল্যাণী তাঁর সেবাদাসী। কল্যাণীর সেবা না পেলে খুশী হবেন না।

লোকে বিশ্বাস করতো সে কথা। বলতো, ভক্তির গুণে যশাই ডোম হয়েও পণ্ডিত। কিন্তু বাঁকুড়া রায় হ'লেন জাগ্রত দেবতা, তাই ব্রাহ্মণ কন্যার সেবা না পেলে অতৃপ্ত থেকে যান।

এ-কথা শুনে হাসতো শুধু ডোমপল্লী। যশাই পণ্ডিত হবার পর তার আত্মীয়স্বজনরাও পণ্ডিত নাম নিয়েছিল, অন্য ডোমদের ছোঁয়া খেতো না তারা। বামুনদের যেমন উপবীত, তেমনি পণ্ডিত ডোমদের 'তাম্র' হ'ত। ধর্মঠাকুরের পূজো দিয়ে হাতে একটি তামার আংটি পরতো পণ্ডিত ডোমরা; 'তাম্র' না হ'লে মণ্ডপে ঢুকতে পেতো না তারা কেউ। 'তাম্র' হওয়ার অধিকারও ছিল না অন্য অন্য ডোমদের।

মনে মনে তাই রাগ ছিল তাদের যশাই পণ্ডিতের ওপর।

তাই শেষ পর্যন্ত অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যের কানে উঠলো কথাটা।

ধর্মরক্ষার কোন পথ খুঁজে না পেয়ে গ্রামেরই এক আশী বছরের কুলীন বৃদ্ধের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ে দিয়ে দিলেন তিনি। আর নিজের বৈঠকখানায় বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন।

বললেন, স্বপ্নাদেশ পেয়েছি, ঐ ডোম কলঙ্ককে গ্রাম থেকে তাড়াতে হবে।

শুনলো সকলে, অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যের বিষ্ণুমূর্তিকে প্রণামও জানিয়ে গেল দু'এক দিন। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। বাঁকুড়া রায়ের মণ্ডপে ভিড় কমলো না এতটুকু। রোগে মড়কে আগের মতই ছুটে যেত তারা যশাই পণ্ডিতের কাছে।

হাঁসের পালক থেকে যেমন জল খসে পড়ে, যশাই পণ্ডিতকে স্পর্শও করে না কোন অপবাদ। আর যেটুকু হাসাহাসি, কানাচুপি তাও ঐ কল্যাণীকে ঘিরে।

অথচ সে অপবাদে কান দেয় না কল্যাণী। বৃদ্ধ স্বামী তার খুকখুক করে কাশে, গল্প করে। আর কল্যাণী থাকে যশাই পণ্ডিতের আখড়ায়।

গভীর রাতে কোন কোনদিন আখড়া থেকে বেরিয়ে বাড়ীর পথ ধরে কল্যাণী, দু'একজন যারা দেখে চাপা গলায় বলে, ডাইনী। পাশের লোক শুনে হাসে।

কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, বললে বুড়ো-বুড়িরা, কান্নার রোল উঠতে শুনে।

বামুনদের মেয়েটার রাস্তা পরিষ্কার হ'ল এবার, বললে ডোমপাড়ার ছেলে ছোকরারা।

যশাই পণ্ডিতের কানে যখন খবর পৌছলো, কল্যাণীর বুড়ো স্বামীকে তখন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

শুনেই শ্মশানে ছুটলো যশাই।

শ্মশানে গিয়ে যখন পৌছলো, চিতা সাজানো হয়ে গেছে। পাশাপাশি জোড়া চিতা।

একপাশে ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছে কল্যাণী। হাত আর পা শক্ত ক'রে বাঁধা তার। মুখের স্বর রুদ্ধ ক'রে আছে কাপড়ের বাঁধন।

সতী হবে কল্যাণী !

সতীই ছিল কল্যাণী মা ! বললেন অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে। তারপর নিজে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন কল্যাণীর বাঁধনগুলো।

ওদিকে গণগণে আগুন জলছে। অন্ধকারে তামাক খেতে খেতে চাঁড়াল দুটো মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে কল্যাণীর দিকে।

না, কল্যাণীর চোখে জল নেই। একদৃষ্টে যশাই পণ্ডিতের আখড়ার দিকে তাকিয়ে আছে কল্যাণী। ওখানে একটা লেলিহান শিখা দুলে দুলে উঠছে আকাশে।

এমন সময় হঠাৎ ছুটতে ছুটতে এলো যশাই।

—কল্যাণী ! কল্যাণী ! চীৎকার করতে করতে এসে পৌছলো যশাই।

আর পরমুহূর্তেই ঝরঝর ক'রে কল্যাণীর দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে বাধা দিতে গেল। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো যশাই। কল্যাণীর বাঁধন কেটে দিলো কোমরের ধারালো ছুরি দিয়ে।

হৈ হৈ ক'রে উঠলো সকলে।—কল্যাণী সতী হবে, কল্যাণী সতী হবে।

রুখে দাঁড়ালো যশাই। বললে, হ্যাঁ কল্যাণী সতীই ছিল। আর আমার বাঁকুড়া রায়, আমার ধর্মঠাকুর যদি সত্যি হ'ন, তা হ'লে কল্যাণী সধবা থাকবে, এ মড়া বাঁচিয়ে তুলবো।

মড়া বাঁচিয়ে তুলবে ! যশাই পণ্ডিত মড়া বাঁচিয়ে তুলবে !

অসম্ভব নয়—সকলেই স্বীকার করলে।

আহা তাই যেন হয়! হঠাৎ অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে যশাই পাণ্ডিতের পা জড়িয়ে ধরলে।

বললে, বাঁচিয়ে তোলো পণ্ডিত, কল্যাণী মাকে যেন চিতায় উঠতে না হয়। ব'লে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে।

যশাই শান্ত স্বরে বললে, আমার ধর্মঠাকুর যদি সত্যি হয় তা হ'লে চিতা থেকে উঠে আসবে কল্যাণীর স্বামী।

হাসি দেখা দিলো কল্যাণীর মুখে, ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে এলো সে গলায় আঁচল দিয়ে যশাইকে প্রণাম করলে।

যশাই তখন পাগলের মত। মুখে কেবল একটি কথা, মড়া বেঁচে উঠবে, মড়া বেঁচে উঠবে।

চিতার সামনে দাঁড়িয়ে মন্ত্রপাঠ সুরু করলো যশাই।

খবর শুনে এদিকে সারা গাঁয়ের লোক জড়ো হয়েছে। থেকে থেকে শাঁখ বাজাচ্ছে মেয়েরা, ডুগি বাজাচ্ছে ঢাকীর দল।

সকলের চোখ চিতায় তোলা বুড়োর মুখের দিকে। উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠায় সেদিকে তাকিয়ে আছে সবাই। চোখে আশা, মনে আশঙ্কা।

শুধু একজনের মুখে শান্ত হাসি আর স্থির বিশ্বাস। যতই সময় যাচ্ছে, ততই তীব্র হয়ে উঠছে যশাই পণ্ডিতের কণ্ঠস্বর। অবিশ্বাস উঁকি দিচ্ছে যেন সকলের চোখে। কিন্তু কল্যাণী একাগ্র মনে তাকিয়ে আছে যশাই পণ্ডিতের মুখের দিকে। ও জানে, মৃতকে জীবনদান করতে পারে যশাই।

গ্রামের লোকেও তো দেখেছে শ্মশানে সারারাত মন্ত্র পড়ে সদাশিব মুকুজ্যের বড়ো ছেলেকে বাঁচিয়ে তুলেছিল যশাই।

কিন্তু রাত ফর্সা হ'ল, ভোর জাগলো তবু চিতার ওপর বুড়োর শবদেহ যেমনকার তেমনি। অথচ সূর্য উঠলে আর কোন আশাই থাকবে না। মড়া বাঁচানোর মন্ত্র সূর্য উঠলে নিষ্ফল হবে।

হঠাৎ চুপ করলো যশাই। সারা শরীরে ঘাম ঝরছে তার তখন। কপালের শিরাটা ফুলে কেঁপে উঠছে। গলার নলীটা বাঁশের মত শক্ত হয়ে গেছে।

মন্ত্রপাঠ বন্ধ ক'রে হঠাৎ চাঁড়ালের হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নিয়ে গ্রামের দিকে ছুটতে শুরু করলো যশাই।

আবার হাত-পা বেঁধে ঘৃত-স্নান হ'ল কল্যাণীর। জোড়া চিতায় পাশাপাশি তুলে দেওয়া হ'ল বৃদ্ধ স্বামীর পাশে সতী ভার্যাকে।

উদ্দাম বেগে ঢোলক বাজলো, শাঁখ বাজলো। উলুধ্বনি আর চীৎকারে চাপা পড়ে গেল কল্যাণীর স্বর। চিতা জ্বলে উঠলো দাউ দাউ ক'রে।

কল্যাণীর মাথার সিঁদুর আর পায়ের আলতা বেলপাতায় মুছে নিয়ে সযত্নে মাথায় ঠেকালো গ্রামের মেয়েরা। তারপর বাড়ী ফিরলো।

ফেরার পথে একজন বললে, যশাই পণ্ডিতের মন্ত্রে ভুল ছিল। তা না হ'লে সদাশিব মুকুজ্যের বড়ো ছেলেকে বাঁচাতে পারল আর একে পারলো না।

অনেকে সায় দিলো এ-কথায়। কিন্তু অন্য সকলে বললে, তা নয় আসলে কল্যাণী অসতী ছিল। তাই কাজ হ'ল না মন্ত্রে।

আর কল্যাণী যে সতী ছিল না তা তো সকলেই জানতো। তা না হ'লে মাঝরাত পর্যন্ত যশাই পণ্ডিতের আখড়ায় থাকতো কেন?

ফিরে এসে কিন্তু দেখলে তারা, বাঁকুড়া রায়ের মন্দিরের দরজায় দমাদম লাঠি পিটছে যশাই।

এর আগে একটা দিনের জন্যেও বাঁকুড়া রায়ের মণ্ডপে আসেননি অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে। সেদিন কিন্তু থাকতে পারলেন না, এসে হাজির হ'লেন সেখানে।

যশাই তখন লাঠি পিটছে কপাটে।

দু'একবার ডাকলেন—যশাই, শোনো, যশাই।

কানে গেল না যশাইয়ের। ধীরে ধীরে সিঁড়ির ওপর বসে পড়লেন অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে। দু'চোখ বেয়ে তখন জল ঝরছে তাঁর।

সেদিকে যশাইয়ের চোখ গেল হঠাৎ। বাঁড়ুজ্যের কাছে এসে বললে, বামুন মশয়, বাঁকুড়া রায় মিথ্যে, বাঁকুড়া রায়ের পূজো আর করবো না আমি।

এই ব'লে কাঁধে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে গেল যশাই।

দিন মাস বছর কেটে গেল, যশাই পণ্ডিতের আর কোন খোঁজ মিললো না। অনেকে ভুলে গেল, অনেকে বললে, কল্যাণী সতী হওয়াতেই মনের দুঃখে আত্মঘাতী হয়েছে যশাই।

বাঁকুড়া রায়ের পূজো করেন তখন অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে। গ্রামের ধর্মঠাকুর, জাগ্রত দেবতা, তাকে তো ফেলে রাখা যায় না। কিন্তু তেমন ভীড় আর হয় না; তেমন বিশ্বাস যেন নেই কারও।'

কে আগের মত তো নিজের চোখে কেউ দেখতে পায় না বাঁকুড়া রায়ের চরণ থেকে জবাফুল ছিট্‌কে ঘটের মুখে এসে পড়ছে কিনা।

লোকে দুঃখ ক'রে বলে, যশাই পণ্ডিত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবতার আশীর্বাদও চলে গেছে।

তবে অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে নিজের মনেই পূজো করেন। হয়তো সতী কন্যা কল্যাণীর শোক ভোলবার চেষ্টায়, হয়তো অনুতাপ আর অনুশোচনা দূর করার জন্যে।

সেদিনও এমনি পূজো শেষ ক'রে শান্তিজল দিতে যাচ্ছেন সকলকে হঠাৎ একজনের দিকে চোখ গেল তাঁর।

যশাই ! পণ্ডিত তুমি !

হৈ হৈ ক'রে উঠল সকলে। যশাই পণ্ডিত ফিরে এসেছে, যশাই পণ্ডিত ফিরে এসেছে।

মুখে হাসি দেখা দিলো সকলের। কিন্তু যশাইয়ের চোখে তখন ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। একরাশ মূর্তি নিয়ে এসে নামলো যশাই। গ্রামে গ্রামে ঘুরেছে সে বছরের পর বছর। যেখানে যে ধর্মঠাকুরের মূর্তি পেয়েছে নিয়ে এসেছে সে, কখনও জোর ক'রে কেড়ে নিয়েছে, কখনও চুরি করেছে।

পরীক্ষা করবে যশাই, কোন্ ধর্মঠাকুরের শক্তি বেশী, কোন্ দেবতা বেশী জাগ্রত, পরীক্ষা ক'রে দেখবে সে।

মন্ত্রপাঠ ক'রে মড়া বাঁচাতে পারেনি সে। বাঁকুড়া রায় কি তা হ'লে মিথ্যে ?

গ্রামে গ্রামে খবর রটে গেল। তীর্থযাত্রীদের ভীড় ভেঙ্গে পড়লো ময়নাপুরের মাঠে।

একটা দীঘির পাড়ে এসে দাঁড়ালো যশাই, তারপর একে একে সব মূর্তিগুলো জলে ছুঁড়ে ফেললো। বাঁকুড়া রায়কেও ছুঁড়ে দিল জলের মধ্যে।

তারপর চীৎকার ক'রে যশাই বললে, সব ঠাকুরকে জলে ফেলে দিলাম আমি। এবার মন্ত্র পড়বো আমি, তোমাদের মধ্যে যে প্রকৃত জাগ্রত ঠাকুর সে আমার হাতে উঠে এসো।

এই ব'লে জলে হাত পেতে মন্ত্রপাঠ সুরু করলো যশাই।

মুহূর্ত কয়েক পরেই সকলে দেখলে একটি মূর্তি উঠে এসেছে যশাই পণ্ডিতের হাতে।

মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠলো যশাই।—এ যে যাত্রা-সিদ্ধি, যাত্রাসিদ্ধির ঠাকুর। আমার বাঁকুড়া রায় কোথায়?

আবার মন্ত্রপাঠ শুরু হ'ল। কিন্তু বাঁকুড়া রায় হাতের কাছে উঠে এলো না।

ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো যশাই। বাঁকুড়া রায় তা হ'লে মিথ্যা, বাঁকুড়া রায় জাগ্রত নয়? এতদিন তা হ'লে মিথ্যার পূজো ক'রে এসেছে সে?

তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে বাঁকুড়া রায়ের মূর্তিটা তুলে আনলে যশাই। তারপর লাঠির ঘায়ে চূর্ণবিচূর্ণ করলে বাঁকুড়া রায়ের মূর্তি।

যশাই পণ্ডিতের আখড়ায় প্রতিষ্ঠা হ'ল যাত্রাসিদ্ধির।

আর অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যেকে তাড়িয়ে দিলো যশাই। বললে, যে বামুন নিজের মেয়েকে জীবন্ত পোড়াতে পারে সে জাত যেন এ মণ্ডপে না ঢোকে। বামুন ছাড়া সব জাতের পূজো নেবেন যাত্রাসিদ্ধি।

চোখের সাম্‌নে হয় তো ভেসে উঠতো সেই একটি দৃশ্য। অগ্নিকুণ্ডের সাম্‌নে বসে গল্প করছে দু'জন চাঁড়াল। পাশাপাশি একজোড়া চিতা সাজানো হয়েছে। আর কল্যাণী। পূর্ণযৌবনা রূপময়ী কল্যাণীর হাতে আর পায়ে কঠিন বাঁধন। বাপ চিতায় তুলে দিয়েছে নিজের কন্যাকে। জীবন্ত দগ্ধ হয়ে গেল চীৎকার ক'রে উঠছে কল্যাণী, সে চীৎকার শুনতে পায় শুধু যশাই পণ্ডিত।

তাই জলন্ত চিতা দেখলেই উন্মাদের মত চীৎকার ক'রে উঠতো যশাই পণ্ডিত।

মৃত্যুর সময়েও যশাই তার শিষ্যদের আদেশ দিয়ে গিয়েছিল, তাকে যেন চিতায় পোড়ান না হয়।

যশাই পণ্ডিতের নির্দেশমত যাত্রাসিদ্ধির মন্দিরের ঠিক্ সাম্‌নে মৃত্যুর পরে তার শবদেহ সমাধিস্থ করা হয়। আর, আর যশাই পণ্ডিতের শেষ নির্দেশ, বামুনদেরও আসতে দিও রামাই।

—বামুনদের?

মৃত্যুর সময় মৃদু হাসি দেখা দিয়েছিল যশাইয়ের মুখে। বলেছিল, হ্যাঁ রামাই, কল্যাণী হয়তো পরজন্মে আবার আসবে। হয় তা বামুনের ঘরেই জন্ম নেবে আবার।

—আমাকে এমন জায়গায় পুঁতে রাখবি রামাই, কল্যাণী এলে যেন তার পায়ের শব্দ শুনতে পাই।

কিন্তু লক্ষ জনের পায়ের শব্দে কি কল্যাণীকে চিনতে পারবে যশাই পণ্ডিত! যাত্রাসিদ্ধির মন্দিরের সাম্‌নে অনাহূত লক্ষ্য লোকের ভীড় জমে, যশাই পণ্ডিতের সমাধির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হয় তাদের। দূর দূর দেশ থেকে হাজার হাজার লোক আসে যাত্রাসিদ্ধির মেলায়।

জেলা—বাঁকুড়া, মহাকুমা—বিষ্ণুপুর। বিষ্ণুপুর থেকে সাত ক্রোশ দূরে ময়নাপুর। ময়নাপুরে যাত্রাসিদ্ধির পূজো দিতে যায় তীর্থযাত্রিরা।

কিন্তু কেউই হয়তো খবর রাখে না, সতীদাহের কলঙ্ক মুছে ফেলার জন্যে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল ডোমপল্লীর একটি অশিক্ষিত পূজারী।

খোঁকি

এক্সপ্যাণ্ডেড মেটালের ছোট ছোট জানালাগুলো না থাকলে প্রিজ্‌ন ভ্যানটার সঙ্গে মালবাহী কোন অন্ধকূপ গাড়ীর পার্থক্য থাকতো কিনা সন্দেহ। পার্থক্য অবশ্য আছেই। সফিউদ্দিন আর আরো আঠারোজন রিম্যাণ্ডের কয়েদীর সঙ্গে তেলের পিপে বা প্যাকিং বাক্সের কোন তফাৎ ওদের চোখে না থাকলেও তফাৎ আছে অন্যদিকে। ক্যাশ আপিসের গাড়ী নয়তো লাটের লিমোজিনে যেমন বন্দুকধারী সিপাই বসে থাকে ড্রাইভারের পাশে, প্রিজ্‌ন ভ্যানের সাম্‌নের আসনেও তেমনি জন দুই সঙ্গীনধারী গোঁফে চাড়া দিয়ে পথচারীদের বুঝিয়ে দেয় এটা মেটাল বাক্সের গাড়ী নয়, পর্দ্দানশীন ইস্কুলের বোরখা-উঁকি মেয়েরাও নেই জাল-জানালার ওপাশে।

সফিউদ্দিন আর আরো আঠারোজন রিম্যাণ্ডের কয়েদী কিন্তু হাঁপিয়ে ওঠে বাতাসবিহীন অন্ধকারের গুমোটে। জাল-জানলায় নাক চেপে পর্দ্দানশীন ইস্কুলের মেয়েদের মতই পথ দেখে, পথের লোক দেখে। তেষ্টায় ছাতি ফাটছে, খিদেয় পাক দিচ্ছে পেট, তবু বলবার উপায় নেই। শুনবে না কেউ, শুনলে ধমক, নয়তো ব্যাটনের ঘা। তেমন তেমন হ'লে বেয়নেটের খোঁচা। তার চেয়ে চোখের তৃষ্ণা মেটানো অনেক সুখের, অনেক আনন্দের।

সত্যি, কতদিন যেন আলো আর হাওয়ার ছোঁয়া পায়নি ওরা। পৃথিবীর এত এত রাস্তাঘাট, লোকজনের মুখ—এ সব কিছুই দেখতে পায়নি। থানার হাজতে নোংরা পচা দুর্গন্ধের মধ্যে মাত্র কটা দিন, তাও যেন কত বছর মনে হয়। চলন্ত গাড়ীর ভেতর রাস্তার আলো-বাতাস উঁকি দিতেই নতুন ক'রে নিঃশ্বাস নিলো যেন সফিউদ্দিন। সফিউদ্দিন আর আরো আঠারোজন রিম্যাণ্ডের কয়েদী নতুন ক'রে বেঁচে উঠলো যেন।

আশ্চর্য! সফিউদ্দিন মনে মনে ভাবে, হাসি হাসি মুখ পথচারীদের দিকে তাকিয়ে ঈর্ষায় জলে যায় ওর বুক অথচ, দু'দিন আগে ও নিজে হেসে হেসে ঘুরে বেড়িয়েছে, সাকসেনার মোড়ের দোকান থেকে ধারে পান কিনেছে, বিড়ি ধরিয়েছে দেওয়ালের দড়িতে। আর আজ? জেলের রাস্তাতেই হয়তো বা। কে বলতে পারে। মামলা তদ্বিরের লোক নেই যার, টাকা নেই উকিলের পেছনে ঢালবার, তার বিচার তো হয়েই আছে।

অথচ সফিউদ্দিন জানে, এক সফিউদ্দিনই জানে, ও নির্দোষ। পাপ ও অনেক করেছে, অনেকবার করেছে। মাসের প্রথম দিনে বুড়ো কেরাণীর পকেট মেরে সারা মাস কাঁদিয়েছে কতবার, অন্ধকার গলিতে প্যারিস্ পিক্‌চার বিক্রীর লোভ দেখিয়ে কত বাচ্চা ছেলের সোনার চশমা, গলার বোতাম, হাতের হাতঘড়ি ছিনিয়ে নিয়েছে। লরেটোয় পড়া কচি মেমসাহেবের নাম ক'রে আড্ডায় নিয়ে গেছে কত উড়ন্তি পায়রার ছানাকে, কেড়ে নিয়েছে তার নোটের বাণ্ডিল। কৈ, তখন তো ধরা পড়েনি ও। তখন তো পুলিশ ওর হদিস পায়নি।

একেই বলে নসীব। বিসমিল্লা উৎরে গেল, গলদ ধরল আল্লায়। সত্যি, মনে মনে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ভালভাবে জীবন সুরু করলো যখন সফিউদ্দিন, তখনই কিনা পুলিশের হাতে কয়েদী। ঘৃণায় অনুতাপে হাতের ছুরিটা যখন ছুঁড়ে ফেলে দিলো তখনই এসে জুটলো হাতকড়া। নসীব! নসীব একেই ব'লে। ভগবান যখন ভাল হতে বলবে, দুনিয়াদারী দেবে বাধা। দুনিয়া যদি ভালো হবার পথ বাৎলে দেয় তো ভাগ্য বাদ সাধবে!

কি হবে অত ভেবেচিন্তে, কিইবা করতে পারে সফি। তার চেয়ে চুপচাপ নিজেকে ছেড়ে দেবে দু'জনেরই হাতে, যে পারে ওকে পথ দেখাক। সেই ভাঙা চার্চের বেঁটে পাদ্রীটা কি যেন বলেছিল একবার। কি যেন নামটা—তার কাছে নিজেকে বিক্রী করতে নিষেধ করেছিলো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শয়তানের কাছে নিজেকে বিক্রী ক'রো না। মনে মনে হাসে সফিউদ্দিন। আরে পৃথিবীর সব ক'টা লোকই শয়তানের কাছে বিক্রী হবার জন্তে তৈরী হয়ে আছে, শয়তান যে ছাই কিনতে চায় না। তা নইলে এমন হাল হয় ওর? বেশ তো ছিলো। পকেট মেরে নয়তো গুণ্ডামী ক'রে আজ যদি ওর জেল

হ'ত, দুঃখ থাকতো না এতটুকু। অথচ কোথাও কিছু নেই, দিব্বি মেহনৎ ক'রে ভালোভাবে বাঁচবার চেষ্টা করছে, সেই সময় কিনা থানাপুলিশের হুজ্জৎ।

কোর্টের ফটকে গাড়ী ঢুকতেই সফিউদ্দিন বললে, ঠিক্ আছে, শালা আবার সুরু করবো।

পাশের কয়েদীটা হাতকড়া-বাঁধা হাত দুটো বেঁকিয়ে পিঠ চুলকোবার বৃথা চেষ্টা ক'রে বললে, পিঠটা চুলকে দেতো সফি।

ওর পিঠের ওপর হাতকড়াটা ঘসতে ঘসতে সফি বললে, শালা আবার সুরু করবো, বুঝলি।

পাশের কয়েদীটা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই প্রিজ্‌ন ভ্যানের দরজা খুলে গেছে, সঙ্গিন উঁচিয়ে সিপাই দুটো এসে দাঁড়িয়েছে দরজার পাশে।

সফিউদ্দিন আর আরো আঠারোজন কোমরে-দড়ি হাতে-হাতকড়া রিফ্যাণ্ডের কয়েদী আদালতের ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলল লক্-আপের পাতাল-পুরীর দিকে। একটা সিপাই আগে আগে, একজন পেছনে খোঁচা দেবার জন্যে।

শেয়ালদার মাছের বাজারেও এত ভিড় দেখেনি সফি। কসাইখানার কার্ণিশেও এত কাকের ভিড় থাকে না, যত না কালা-কুর্তার ভিড় এখানে। সাদা প্যাণ্ট আর কালো কালো গলাবন্ধ কোট-পরা উকিলের ছড়াছড়ি। সবাই ব্যস্ত, সবাই কাজের লোক। সময় নেই যেন এতটুকু। সব ব্যাটা রক্তচোষা বাদুড়, মনে মনে ভাবলে সফি। পাৎলুন পরেছে বাবুরা। এদিকে কাদার ছাপ, পানের ছোপ লেগে বাহার যা খুলেছে বলবার নয়। বছরে দু'বার ধোপার বাড়ী যায় কিনা সন্দেহ, কোটটা যে যায় না সে-ত জানাই। ঐ পচা পুরোনো কুর্তা একবার ধোপার কাছে গেলে ফিরবে নাকি আর! তীর্থের কাকের মত ছোটাছুটিই সার, বিকেলে বাড়ী ফেরবার সময় পকেট ভরে ডুমুর কুড়িয়ে নিয়ে যায়, তাই হাঁড়ি চড়ে। তবু টেনে টেনে ইংরেজী বলে কেমন, যেন সিম্পসন সাহেবের ছোট ছেলে। যেখানে বারো আনার ষ্ট্যাম্প লাগবে, চেয়ে বসবে বারো টাকা। তারপর একে ঘুষ দিতে হবে ওকে ঘুষ দিতে হবে, ডেমি কেনো, টাইপ করাও—কত কি। নিজের ফি'টাও হাঁকবে কম নয়। আর সারাটা ক্ষণ স্তোক দেবে, খালাস পাবি খালাস পাবি ব'লে, তারপর এক নিঃশ্বেসে বলবে, যা ব্যাটা তোর পাঁচ বছর জেল হ'ল।

উকিলদের কথা কম শোনেনি ও ছোটবেলা থেকে। একটা কথা ভালো ক'রে শুনবে না, লিখে রাখবে না কাগজে-কলমে, আর হাকিমের এজলাসে গিয়ে উল্টো-পাল্টা বকে আসবে হাত-পা নেড়ে।

না, উকিল দেবে না সফি, তার চেয়ে জেল খেটে আসবে সেওভি আচ্ছা।

ও যে হাজতে আছে, সাকিনাও হয় তো সে খবর পেয়েছে। কে জানে কি ভাবছে মেয়েটা। ভাবছে হয় তো, সফি সত্যিই এই সব নোংরা ব্যাপারে জড়িয়ে আছে। অনেক ক'রে সাকিনাকে বুঝিয়েছিল ও, চুরি-পকেটমার রাহাজানি সব ছেড়ে দিয়ে শরীফ হবার চেষ্টা করছে। সাকিনা এখন কি আর বিশ্বাস করবে? ওর সঙ্গে নতুন ক'রে ডেরা বাঁধতে রাজি হবে আর?

ঘরে বুড়ি মা আজ মরে কি কাল মরে, মনে রঙিন স্বপ্ন সাকিনাকে নিয়ে ঘর বাঁধবার, তার ওপর ভদ্রঘরের মেয়েকে জোর-জবরদস্তী নিয়ে এসে লুকিয়ে রাখার ব্যাপারটাও মনে মনে ঘেন্না করে সফিউদ্দিন। তাই না ওর এত লজ্জা, এত ভয়। লোকে কি বলবে, লোকে কি ভাববে তা নয়, সাকিনা কি বলবে, সাকিনা কি ভাববে! তাই। তাই ওর মত অমন চওড়া কাঁধের নওজোয়ান মানুষ, যে কিনা একদিন খুন-জখমে ভয় পেত না, যার একটা চড় খেয়ে টমি সার্জেণ্ট নালার জলে মুখ থুবড়ে পড়েছিল, সেও পুলিশ সাহেবের পা জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিল!

—আমাকে ছেড়ে দিন হুজুর, আমি এসবের মধ্যে নেই হুজুর।

পুলিশ সাহেব হেসে বলেছিলো, তা হ'লে ছাড়াই পাবি।

—কি ক'রে ছাড়া পাবো হুজুর? আশায় আনন্দে চকচক্ ক'রে উঠেছিল সফির চোখ। আর পুলিশ সাহেব মুচকি হেসে বলেছিলো, হাকিমের এজলাসে আইন আছে রে ব্যাটা। হাকিম ধরে নেবে তোর কসুর নেই, আমরা প্রমাণ করবো তুইও আছিস এরমধ্যে।

—তা হ'লে হুজুর? আশা-ভরসা হারানোর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সফি।

উত্তর আসে, তোর দোষ না থাকলে আমরাও তো প্রমাণ করতে পারবো না। তা হলেই খালাস পাবি।

ফুঃ। মনে মনে ঘৃণার হাসি হেসেছিল সফি। প্রমাণ, প্রমাণ ও অনেক দেখেছে, পুলিশকেও দেখেছে। আর হাকিম? দেখেনি বটে, কিন্তু শুনেছে

অনেক। মামলা হয়ে যাওয়ার পর নাকি পুলিশের উকিল কানের কাছে গিয়ে ফিসফিস ক'রে আসে।

বিচার। বিচার হবে ওর। কিসের বিচার? অপরাধ করেছে কি করেনি, তার বিচার? না, টাকার। শুধু টাকার বিচার, তা সে যে পথেই যাক, যে পথেই ঢালো। হয় টাকায় পুলিশের মুখ বন্ধ করো, তার ডাইরীর পাতা ছিঁড়ে ফেলবে পুলিশ, আর তাও যদি না পারে তো এমন ফাঁক রাখবে যে সুড়ুৎ ক'রে পার পেয়ে যাবে তুমি। আর তা যদি না চাও তো টাকা ঢালো অন্যদিকে। নিয়ে এসো বড়ো আদালতের এমন উকিল-ব্যারিষ্টার যাকে দেখে ছোট হাকিম ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপবে। কত বড় বড় সাক্ষীসাবুদ তৈরী হয়ে যাবে টাকার জোরে। উকিলের বুদ্ধিতেই যদি হাকিমের রায় এদিক ওদিক হয়, তা হলে আবার বিচারটা কোথায়? আইনে আসামীকে নির্দোষ ধরে নেওয়ার সার্থকতা কোথায়?

সফি নিজেতো জানে এ ব্যাপারটায় ওর হাত ছিল না মোটেই। যা সত্যি, যা জানে ও নিজেই বলবে হাকিমকে। পুলিশের শানানো বানানো কথায় চোরামি আছে কিনা, মিথ্যে আছে কিনা হাকিম খুঁজে বের করবে, ক'রে বে-কসুর খালাস দেবে ওকে। হ্যাঁ, তবেই বুঝবে বিচার আছে।

পুলিশ সাহেব বলেছিলো, হাকিম জিগ্যেস করবে 'গিল্টি' না 'নট গিল্টি।' বলবি, গিল্টি হুজুর, অন্যায় হয়ে গেছে আর করবো না। তা হ'লে ফাইন ক'রে ছেড়ে দেবে। তা নইলে—

শুনে হেসেছে সফি। গিল্টি! গিল্টিতো পৃথিবীর সবাই, আসল সোনা কি আর আছে নাকি পৃথিবীতে। কিন্তু অন্যায় হয়েছে, কসুর হয়েছে একথা বলবে কেন ও? ও তো সত্যিই কোন দোষ করেনি।

মুখে বললে, হুজুর, আমি তো কসুর করিনি কিছু। মাপ চাইবো কেন হুজুর?

উত্তর এসেছিলো ভারী বুটের ঠোক্করে।

তেমনি আরেক ঠোক্কর খেয়ে মন ফিরে এলো সফির। আদালতের হাজতে। হাজতের ফটক অবধি যখন আসতে পেরেছে ও, তখন কি আর বুটের ঠোক্কর না দিলে ভেতরে ঢুকতো না?

যাক্।

সফিউদ্দিন আর আরো আঠারোজন রিম্যাণ্ডের কয়েদী হাজতের নোংরা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়লো। তারপর তাকালো চারপাশে।

মাটির নীচেও যে ঘর থাকে তা জানতো সফি ; আগেও দেখেছে। গুণ্ডা গোসাইয়ের আড্ডায় যখন নাম ছিল ওর, তখন দশেরায়, বথ্‌রিদে এমনি এক চোরাকুঠরি পাতালপুরীতে সারা রাত চলতো ওদের জুয়ার গুলতানি। তাস আর মদ। আর সস্তা মেয়ের চোখ-কাঁপানো বুক-ঝাঁকানো গান। আবার লুঠের মাল, সাফাই করা সোনাদানা এনে রাখতো সে-ঘরে, ভাগবাঁটরার আওয়াজ পেলেই এসে জুটতো সবাই। কিন্তু সে-ঘর মাটির নীচে সাপের গর্তর মতই ছোটখাটো, কাঁধে-কনুইয়ে ঘেঁষাঘেঁষি হ'ত সাতটা লোক ঢ়'কলে, তিনটে মেয়ে আনলে ঠাঁওর হ'ত না কে কার কোলে।

এ-ঘর কিন্তু সে-ঘর নয়। কম ক'রে একশো কয়েদী দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসতে পারে এখানে। আর উঁচুই বা কম কি, জেলের দেওয়ালকেও হার মানায়। সুড়ঙ্গের মত সিঁড়িটা এসে নেমেছে এ ঘরে, আর ঐ সিঁড়ির মুখে লোহার ফটক আব্‌ছা আব্‌ছা আলো ছুঁড়ছে। কিন্তু এত আলো তবে আসছে কোত্থেকে? ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলে সফি। হাঁা, একদম মাথার ওপর, পঞ্চাশ হাত ওপরে এ ঘরের ছাদ, আর সেই ছাদের ঠিক মাঝখানটায় লোহার জাল দিয়ে ঘেরা। তারও বিশ হাত ওপরে আস্‌লি ছাদ। আদালতের তিনতলার জানালায় ঠিকরে যেটুকু আলো ঢুকছে তারই খানিকটা উঁকি মারছে ঐ জালের ছাদ থেকে। হ্যাঁ, জালের চারপাশটা যেন রেলিং দিয়ে ঘেরা, তাই মনে হ'ল সফির, রেলিংএ ভর দিয়ে দু'চারটে লোক ওদের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে, সফি দেখতে পেলো।

কেমন যেন গা শিরশির ক'রে উঠলো, নিজকে ছোট মনে হ'ল ঐ লোক-গুলোর কৌতূহলী চোখের সাম্‌নে। অন্যদিকে চোখ ফেরালো সফি। আর দেখলে, আরেকটা সুড়ঙ্গ এদিক দিয়ে উঠে গেছে ওপরে।

পাশের লোকটাও সেদিকে তাকিয়েছিল, নিজের মনেই যেন বললে, এইদিক দিয়ে হাকিমের সাম্‌নে যেতে হয়।

—তাই নাকি ?—অন্য কে প্রশ্ন করলে অবাক বিস্ময়ে।

—হুঁ! মাথা নাড়লে দাগী সবজান্তা।—হাকিমের ঘরেও আবার এমনি জালের খাঁচা। শালারা আমাদের শের ভাবে, না শয়তান ভাবে?

—পাকিটমারকে জামিন দেবে না; আর শরীফ কেউ খুনী আসামী হলেও পি. আর. দিলিয়ে দেয়। কে যেন বললে।

সফি শুনলো, শুনে হাসলে।—জামিন খাড়া হবার মত কেউ আছে নাকি আমাদের?

—আছে রে বেটা, আছে।

—কে?

বুড়ো মিঞা সাহেব দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে আকাশের দিকে হাত দেখালে।

সবাই হাসলো ওর কথায়, তারপর ভারী জুতোর মচ্‌মচানি শুনে সকলে একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালো।

ভারী জুতোর কনেষ্টবল গড়গড় ক'রে নাম ডেকে গেল একরাশ, তারপর হাঁক ছাড়লো চাঁছা গলায়, চলো সব।

অর্থাৎ ঐ সুড়ঙ্গ ধরে হাকিমের ঘরে চলো সব।

সকলের সঙ্গে সফিও সিঁড়ি বেয়ে এসে হাজির হ'ল হাকিমের ঘরে। আঃ, এত আলো এত বাতাস যেন এই প্রথম দেখতে পেলো ও, স্পর্শ পেল। ছোট্ট লোহার খাঁচায় ওরা এতগুলি লোক ঠাসাঠাসি ক'রে দাঁড়িয়ে, তবু বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারছে।

হগ সাহেবের বাজারে কাঠের খাঁচায় মোরগ-মুরগির ঠাসাঠাসি দেখেছে সফি কতবার। আজ নিজেদের ঠিক সেই মোরগের মত হাল। লোহার জালে মুখ চেপে ভাসা ভাসা চোখ মেলে তাকালে ও হাকিমের মুখের দিকে। হাকিমের মেজাজ বোঝবার চেষ্টা করলে। হাকিম হাসলে ওরা স্রেফ খালাস পাবে।

আচ্ছা, এজলাসের সারিবন্দী বেঞ্চিতে বসা ঐ উকিলগুলো কি ওদের খুনি আসামী ভাবছে? শুধু কালা-কুর্তা উকিলই নয়, ভদ্রলোকও কয়েকজন রয়েছে পিছনের সারিতে। জালে মুখ চেপে সেদিকে তাকাতে গিয়ে সফির চোখ পড়লো এক কোণে। আরে! সাদাসিধে একখানা ফিরোজা রঙের সাড়ী পরা অমন মিঠে মুখ এই পিঁজরাপোলে?

সিঁথিতে সিঁদুরের টান, চোখে ক্লান্তি—তবু বড়ো ভালো লাগলো সফির। কিন্তু ওরও কি এমনি হাল নাকি? কে জানে!

ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলে সফি। গালে কপালে ঘাম ঝরছে মেয়েটির, শাঁখা আর সরু চুড়ির ফাঁকে ফর্সা হাত দু'খানা যেন বড়ো রোগা রোগা, মনের চিন্তা দেহের অসুস্থতা যেন একজোট হয়ে ওদের চোখের পাতা ভারী ক'রে দিয়েছে!

সফির নিজের মন থেকে সব ভাবনা-চিন্তা জেলের ভয় উবে গেল এক নিমেষে। শুধু বুকের ভেতর অনুভব করলে এক অবোধ্য ব্যথা। অচেনা একটি মেয়ের রোগপাণ্ডুর মুখের ছায়া যেন সবসময় ঘরখানাকে মেঘ-থম্‌থম্‌ বিষণ্ণতায় ডুবিয়ে দিয়েছে।

একটা কি শব্দ হ'ল। আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে ফিরে তাকালো মেয়েটি ওদের জালঘরের দিকে। তন্ন তন্ন ক'রে লোকগুলোর মুখের দিকে তাকাচ্ছে মেয়েটি; সফির মুখের আর চোখের ওপর দিয়েও যেন সে চোখের দৃষ্টি ভেসে গেল মুহূর্তের জন্যে। সব দুঃখকষ্ট অভিমান মুছে নিয়ে গেল ওর মন থেকে।

আচ্ছা, কি ভাবছে মেয়েটি। ওখান থেকে কেমন দেখাচ্ছে ওদের? চিড়িয়াখানায় লোহার জাল দিয়ে ঘেরা ঘরের ভেতর জানোয়ারের পাল ভাবছে নাকি মেয়েটি?

ও, এইবার বোঝা গেছে। ওপাশের ঐ লম্বা স্যুটপরা লোকটাই ওর স্বামী। ও লোকটাও আসামী, বেশ বুঝতে পারছে সফি। তবু, আশ্চর্য, হেসে বললে হাকিম। মানীগুণী লোক হয়তো। কিন্তু আসামী লোকটাতো আসামীই। ওর উকিলের পোষাক-পরিচ্ছদ দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওপরের আদালত থেকে এসেছে। জবর কেস তা হ'লে নিশ্চয়ই।

কিসের মামলা? কে জানে, জেনেই বা কি হবে সফির। হ্যাঁ, মামলা ওদের আগেই হয়ে গেছে, আজ বুঝিবা রায় বেরুবে। মেয়েটির ঠোঁট-জোড়া কাঁপছে নাকি! হয়তো। ভয়ে আশঙ্কায় চোখে কেমন এক উদাস চাওয়া।

ইংরেজীতে কি সব বলাবলি হ'ল, বুঝলো না সফি। শুধু মনের ভেতর অনুভব করলে কিসের এক ব্যথা। আহা, লোকটা ছাড়া পাক, লোকটা

বেঁচে যাক্, ভাবলে ও। শুধু ঐ মেয়েটির ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে সফি ভাবলে।

অনেকক্ষণ ধরে কি যেন পড়ে চলেছে হাকিম। আর মেয়েটি একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে হাকিমের মুখের দিকে, প্রত্যেকটি কথা শুনছে মন দিয়ে। আশঙ্কায় ভয়ে ক্রমশঃ যেন রক্ত জমে উঠছে মেয়েটির মুখে, কপাল বেয়ে ঝরে পড়ছে মুক্তোর মত বিন্দু বিন্দু ঘাম।

হঠাৎ সমস্ত মুখখানা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মেয়েটির। পৃথিবীর সমস্ত হাসি যেন একসঙ্গে এসে জড়ো হয়েছে ওর মুখে, আনন্দে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালো মেয়েটি। লোকটির মুখের দিকে তাকালে, চোখাচোখি হ'ল, আর তার মুখেও একটা ফিকে হাসি দুলে গেল।

জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে মেয়েটি, আর হাসছে, প্রাণ খুলে হাসছে। নতুন-জাগা ঝর্ণার মত, জ্যোৎস্না রাতের সমুদ্রের ফেণার মত হাল্কা আর উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে পড়েছে মেয়েটির সারা মুখে, চোখে চোখে।

খালাস। খালাস পেয়েছে লোকটা। যাক্। নিজের কথা ভুলে গেল সফি, পাথর-চাপা বুক ওর হাল্কা হয়ে গেল। কিন্তু এবার, এবার তো মেয়েটি একবার তাকাতে পারে ওর দিকে। ঐ হাসিভরা চোখ কি একবার সফির মুখের ওপর ফেলতে পারে না। ওর উৎকণ্ঠায় সফিও নিঃশ্বাস চেপেছিল এতক্ষণ। ওর আনন্দে সফির চোখেও খুশি নেমেছে।

—খালাস হো গিয়া। কে যেন বললে।

—ওদের জেল আর খালাস! কে যেন মন্তব্য করলে।

বুড়ো মিঞাসাহেব দাড়িতে হাত বুলিয়ে বুঝিয়ে দিলে ব্যাপারটা। অর্থাৎ জেল হলেও নাকি আরামে থাকতো ও। সাহেবী ওয়ার্ডে থাকতো, মিলতো নবাবী খানাপিনা। আর কাজ? ঘানি ঘোরাতে হ'ত নাকি ওকে? বসে বসে হিসেব লিখতো দিনে দু'চার ঘণ্টা, আর নয়তো স্রেফ হাসপাতালে গিয়ে পড়ে থাকতো। শালা 'এ কিলাস আসামীরা' তোফা থাকে। জেলখানার ডোরা কাটা সার্ট-পাৎলুনও পরতে হ'ত না।

ওরা সবাই বিস্ময়ে শুনলো কথাগুলো। কেউ বিশ্বাস করলো, কেউ করলো না। কিন্তু বিস্মিত হ'ল সবাই। সত্যি কি তা হয় নাকি? তবে আর বিচারটা কোথায়? মনে মনে ভাবল সফি। শুধু আদালতেই নয়,

জেলখানাতেও সেই টাকার দাম? যার দৌলত আছে তার কয়েদ কয়েদ নয়? কিন্তু মেয়েটি একবারও এদিকে তাকাচ্ছে না কেন? যার জন্তে নিজের ভয় ভাবনা ভুলে সহানুভূতিতে ভিজে এসেছিল সফির চোখ, কৃতজ্ঞতায় সে একবারও কি তাকাতে পারে না সফির দিকে?

হঠাৎ নিজের নাম শুনে চমকে ফিরে তাকাল সফি।

—ডু ইউ প্লিড গিল্টি? অর নট গিল্টি? গড়গড় ক'রে ব'লে গেল লোকটা।

হিন্দিতে অনুবাদ ক'রে দিলো আরেকজন।

লোকটার, তারপর হাকিমের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলে সফি, তারপর হাসতে হাসতেই বললো, গিল্টি।

গিল্টিই তো। সারা দুনিয়া গিল্টিতে ছেয়ে গেছে, আসল সোনা কি আর আছে হুজুর। সব গিল্টি, বেবাক্ গিল্টি সব।

সফি নিজে অন্ততঃ জানে, যে অপরাধে ওকে নিয়ে এসেছে সে অপরাধ ও করেনি। তা ব'লে সাচ্চা সোনাও তো ও নয়, কেউই তো নয়। আর, আর সাচ্চা সোনার দাম তো দুটো চাঁদির চাকতির কাছে বিকিয়ে গেছে।

সফি আবার একবার আরো জোরে বলে উঠলো, গিল্টি, গিল্টি হুজুর।

হুজুরও গিল্টি, এ কথা আর বললো না।

খাবে-কোবিলি

সবে সিনেমা শেষ হয়েছে তখন। শেষবিকেলের বাতাস হঠাৎ হৈ-চৈ ক'রে উঠলো। মৌচাকে ঢিল ছুঁড়লে যেমন পিল পিল ক'রে বেরিয়ে আসে মধুপের দঙ্গল, ঠিক তেমনিভাবেই সিনেমা দর্শকদের ভীড় ছিটকে পড়লো সাম্‌নের সদর রাস্তায়।

আশু মুকজ্জে সড়ক ধরে উত্তরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কোন বিশেষ কাজেই হয়তো বা। পর্দার ছবি দেখে নেশার আমদানী হয়েছিলো মগজে। মিলনান্ত নাটকের তৃপ্তিতে নায়ক-নায়িকার মুখের চকচকে প্রশ্নোত্তরের রাশি বার বার ভাবছিলাম। ঠিক ভাবছিলাম যে তা নয়, বরং বলা চলে মনে মনে রোমন্থন করছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়লো, একটি থামা রিক্সায় দূর্বা দেবী বসে রয়েছেন। স্থিরলক্ষ্য দৃষ্টিতে অপেক্ষমানার অধীর আক্ষেপ। দূর্বা দেবীর চোখের নিশানা অনুসরণ ক'রে সুজিতকে খুঁজে বের করলাম। এক ঠোঙা খাবার হাতে ক'রে দোকানদারকে পয়সা দিচ্ছিল সুজিত। বছর পাঁচেকের একটি ছেলে বিস্মিত শঙ্কায় ওর জামার আস্তিন ধরে দাঁড়িয়েছিল। অমিতাভ ওর নাম, দূর্বা দেবীর একান্ত অনুরোধে ছেলেটির নামকরণ করতে হয়েছিল আমাকেই। দূর্বা দেবী সুজিতের সহধর্মীণী।

অমিতাভ বা অমুর ভয়ের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে যে দৃশ্যটি চোখে পড়লো, তা ভুলতে পারবো না কোনদিন। আর সুজিতকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারি না আজ তার কারণও সেদিনের ঐ দৃশ্য।

খানিক দূরেই একটা পাগলী। কি জাতের মেয়ে বলা যায় না। পাগলীদের আবার জাত আছে নাকি! পাড়ার ছেলে-বুড়োদের কাছে ওর নাম খুতু। উস্কখুস্ক রুক্ষু চুল, তামাটে রঙ, ভৈরবীর মত ব্রহ্মতালুতে ঝুঁটি বাঁধা। কাদা মাখানো করকরে চুল, কুঁচকাঠি নয়তো সজারুর কাঁটার সঙ্গে

দেওয়া চলে তুলনা। চোখের তারা দুটো জলছে ধক্‌ধক্ ক'রে, যেন গিলে খাবে। আমসির মত শুকনো চেহারা, খানকয়েক হাড়ের ওপর শ্লথ চর্মাবরণ। কোমর থেকে ঝুলছে এককালি চটের টুক্‌রো, এ ছাড়া সর্বাঙ্গ তার উলঙ্গ। ছেলে কি মেয়ে, বোঝবার জো নেই হঠাৎ দেখে।

পাগলী এগিয়ে এলো। একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন, পাগলী এসে হাত পাতলো। ভদ্রলোক একটা পয়সা বের ক'রে তার হাতে দিতেই পয়সাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে এক দলা থুতু ফিচ ক'রে ফেললে সে সটান ভদ্রলোকের গায়ে। ঐ ওর স্বভাব। তাই ওর নাম হয়েছে থুতু। থুতু এবার গজগজ করতে করতে এগিয়ে এলো স্বজিতের সাম্‌নে। চোখের ইসারায় নিষেধ করলাম স্বজিতকে। পয়সা না দিলে রেহাই আছে, বড় জোর গালাগালি দিয়ে সরে পড়বে, কিন্তু পয়সা দিলেই—থুতু।

স্বজিত ঐ পাগলীকে চেনে না, কিন্তু আমি চিনি। অস্পষ্ট অতীতটা পাগলীকে দেখলেই চোখের সাম্‌নে ঝক্‌ঝক্ ক'রে ওঠে অনেক স্বপ্ত ইতিহাস। আজ স্বজিতকে কত স্বাভাবিক মনে হয়। দূর্বা দেবীকেও। সিনেমা দেখছে, দশটা-পাঁচটা চাকরী করছে। আর পাঁচজনের মতই হপ্তায় একটা দিন লুটে খায়, বাকী ছ'দিন নিজেকে নিঙড়ে নিঃশেষ করে ফেলে। অথচ এই স্বজিতই সেদিন বশ মানতে চায়নি।

সায়ান্সের শেষ পরীক্ষাটা অবধি আমি স্বজিত সেনের সতীর্থ ছিলাম। পাশাপাশি দু'খানি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতাম আমরা দু'জনে। বেশ ছিলাম স্ফূর্তিতে, আমোদে, আহ্লাদে। ভাবনা-চিন্তার মধ্যে ছিল এম. এস সি. তে ফার্ষ্ট ক্লাশ পাওয়া ভালো, না একটা তেলের পেটেণ্ট বের ক'রে ফেল হওয়াটা বেশী গৌরবের।

আর একটা চিন্তা ছিল, আমার নয়, স্বজিতের।

রোজ বাসার সাম্‌নে দিয়ে যেত একটি মেয়ে। এক বুড়ি কাচের বাসন মাথায় ক'রে ফেরী করে বেড়াতো। ছেঁড়াফাড়া কাপড়ের বদলে বাসন বিক্রী করতো সে। নিটোল দেহ নয়, দেখলেই বোঝা যায় বয়স আর খাটুনির দস্যি-পনায় শরীর ঢিলে দিয়েছে। ঢলঢলে মুখ। বয়স্কা ফাজিল মেয়েদের হাসি যেমন হয়, তেমনি একটা নষ্টামির হাসি লেগে থাকতো সেই মুখে। পিঠের সঙ্গে মিশে থাকতো লাল রঙের ময়লা আঁট ব্লাউজ। আঙিয়া ধরণের খাটো

ব্লাউজ, তেল আর ঘামের চিট ধরা। আর কাঁধে কাঁথালে ছিল সক্ষমতার খাটুনি।

—টুটাফাটা কাপড়ার বদ্‌লি নয়া ডিজাইনের বর্তন লেবে গো? এই ছিল ওর মুখের বুলি।

আমাদের বাসার সাম্‌নে এসেই ফেরীউলীর চীৎকার থামতো। সুজিতের চোখে চোখ রেখে হাসি ছিটিয়ে লোভের ইসারা ছুঁড়তো ও। সুজিতের মূক মুখে ঠাট্টার ধারালো নিশানায় উত্তরের আভাস পেত মেয়েটি। অর্থাৎ পরস্পরের পরস্পরকে ভাল লেগেছিল। সুজিত হঠাৎ একদিন তাই ডেকে বসলো তাকে। তার ঝুড়ি থেকে একটা কাঁচের পেয়ালা তুলে ধরে জিগ্যেস করলে দাম।

সে বললে ছ'খানা কাপড় তার কিম্মৎ।

বিদ্রূপের ভঙ্গিতে সুজিত বললে, মোটে ছ'খানা? নতুন কাপড় নেবে বুঝি?

—হ্যাঁ, রেশমি শাড়ী চাই। কথার ভাঁজে বেশ একটা মন-মজানো হাসি দুলিয়ে দিলে ও ওর ঠোঁটের ফাঁকে।

—ওঃ, ছ'খানা রেশমি শাড়ি?

মেয়েটি উত্তর দিলে, বড় কঞ্জুস তুমি বাবু। তারপর গম্ভীর হবার ভাণ ক'রে মাথায় ঝুড়িটা তুলে নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লো। মুখের বুলি ফিরিয়ে এনে তরতর ক'রে চলে গেল সামনের গলি দিয়ে। সুজিতের পিয়াসী চোখ তাকিয়ে রইলো।

আঙুরলতার লতানে গাছ দেখেছেন? আর রসে শাঁসে মিশ খেয়ে আছে এমনি বেগুনি রঙের রসালো আঙুরের থোকা?

পরের দিনও এলো সে, তারপরের দিনও এবং তারপরের পরের যে দিন-গুলিতে আসতো সে শুধু সুজিতের কাছে শুনতে পেতাম।

এই বাসনওয়ালীর নাম নাকি কাঞ্চী। সত্যি মিথ্যে যাচাই করার পথ ছিল না—ঐ নামই বলেছিল সুজিত।

আশ্চর্য! সেদিনের সুজিতের সে উদ্ধত যৌবনের সঙ্গে আজকের সুজিতের কত পার্থক্য। কত স্বাভাবিক তার সংসারী রূপ। স্ত্রী দুর্গা দেবীকে সিনেমা দেখাচ্ছে। আর পাঁচজনের মত হপ্তায় একটা দিন লুটে খেয়ে বাকী দিনকটায় নিজেকে নিঃশেষে নিঙড়ে ফেলছে।

বেশ আছে এরা। অথচ—। আমাকেও তো যৌবনের লাগামে একদিন টেনেছিল একটি তন্বী তরুণী। মেয়েটির আসল নাম বলবো না। বাপ ভালো চাকরী করতেন একটা পাবলিসিটি অফিসে। সামান্য লে আউট আর্টিষ্ট হয়ে ঢুকে ক্রমে ক্রমে প্রোডাকশন্যাল ম্যানেজারের পদে পদস্থ হন। মেয়েকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন বিস্তর, প্রেম এবং বিবাহের ক্ষেত্রেও। অসুবিধা দূর করার জন্যে ধরে নেওয়া যাক্ মেয়েটির নাম উৎপলা।

সুজিতেরই এক আত্মীয়ার বন্ধু এই উৎপলা। সুজিতেরই অনুগ্রহে উৎপলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমার। কাঞ্চীর কথা শুনিয়ে শুনিয়ে বিরক্ত ক'রে তুলতো সে আমাকে। তবু ভাবতে বিস্ময় লাগে, উৎপলার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা আজও জানে না সুজিত।

উৎপলা সুন্দরী। গর্ব ক'রে বলছি না, অপরের কানাঘুষো শুনেই বলছি, আমিও অসুন্দর নই। রূপে, গুণে, কালচারে বা টেষ্টে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ ছিল না। রাজনীতিতে বোধ হয় উভয়েই একমত ছিলাম বা উভয়ের কারোরই বিশেষ কোন মতই ছিল না। তবু বলতে লজ্জা নেই, আমাদের প্রেমে কৃত্রিমতার খাদ ছিল অনেকখানি।

প্রথম প্রেমের গোপন আলাপ কিভাবে হয়েছিল তা বলতে চাই না। সেটা সাধারণভাবেই হয়েছিল এবং সাধারণ কিছুর উল্লেখ ক'রে গল্পের হানি করবো না।

গায়ে গা লাগিয়ে অনেক সাদা আকাশ আর রাঙা চাঁদ দেখেছি আমি ও উৎপলা। উৎপলার কথা বলতে পারি না, তবে আমার ভালবাসা কষ্টিপাথরের উপর চিকচিকে দাগ তুল্‌তে পারতো না। উৎপলার প্রেমও বোধ হয় নিখাদ ছিল না। অর্থাৎ আমাদের পরিচয় হয়েছিল এমন একটি বয়সে, যখন ব্যক্তি-বিশেষকে ভালবাসার চেয়ে যে কোন একজনকে ভালবেসেছি মনে করতে ভালো লাগে। তাই পরস্পরের মধ্যে অনেক মিথ্যে প্রেমালাপ সত্যিকারের ঢঙে আদান-প্রদান চলতো।

কিন্তু সুজিত-কাঞ্চীর সম্বন্ধটা কোনদিন স্বপ্নেও মিথ্যে ব'লে মনে হয়নি।

বাসায় ফিরছিলাম। হঠাৎ সেদিন থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম সুজিতের ঘরের সাম্‌নে। কাঞ্চী কাঁদছে। সুজিতের পা জড়িয়ে ধরে কাঞ্চী কাঁদছে। ওর চোখের পাপড়ি থেকে ঠোঁট অবধি একজোড়া অশ্রুরেখা ফুটে উঠেছে।

বহুদিন পরে কাঞ্চীকে দেখলাম। দেহে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে ওর। মেদবহুল হয়েছে প্রতিটি অঙ্গ। গালে লাবণ্যের প্রাচুর্য্য নেমেছে। আয়েসী শৈথিল্য ওর চোখের দৃষ্টিতে। আড়ালে ওৎ পেতে দেখছিলাম কাঞ্চীকে।

—তোমার মোহব্বৎ এমনি ঝুটা বাবুজী! গরীবের কি শরম নেই, বস্তির বাসিন্দারা কি বলবে বাবুজী!

সুজিতের উত্তর শুনলাম, নাও এই টাকা ক'টা রাখো।

সঙ্গে সঙ্গে ঝন্‌ঝন্ ক'রে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়লো টাকাগুলো। কাঞ্চী কেঁদে ফেললে ঝর্‌ঝর্ ক'রে। বললে, কে মেগেছে তোমার রুপেয়া; চাই না, চাই না। বস্তির ডগদার সাবকে ধরে হাসপাতালে চলে যাবো, আর বাচ্চাকে তোমার কাছ থেকে একটা পাইও নিতে দোব না কখনও। ব'লেই বেরিয়ে চলে গেল কাঞ্চী আমার সাম্‌নে দিয়ে।

আজ সুজিত স্ত্রী দূর্বা দেবীকে নিয়ে মেতে উঠেছে। ছেলের হাত ধরে খাবার কিনছে। অমিতাভ আর দূর্বা দেবীর মাঝখানে ও স্বর্গের স্বাদ পেয়েছে। অথচ পাগলী ঘুরে ঘুরে হয়রাণ। হাত পাতছে পয়সার জন্যে। তমাটে রঙ, ভৈরবী বেশ, শুকনো উলঙ্গ চেহারা, কোমর থেকে ঝুলছে এক ফালি চট। পয়সা চায়, পেলে থুতু দেয় গায়ে, না পেলে গালাগাল। পাগলীর নাম হয়েছে তাই থেকে থুতু। ওর আসল নাম তো দূরের কথা সুজিত আজ আর ওকে চিনতেই পরছে না।

অদ্ভুত! সেদিন কিনা এই সুজিত-কাঞ্চীর সম্পর্কটা আমার মনে হয়েছিল ধ্রুব সত্য। উৎপলাকে ভেবেছিলাম মিছে আর মেকী। কিন্তু আজ মনে হয় তার সবটাই জাল-জোচ্চুরি ছিল না। আসল কথা উৎপলা যে নিজেকে আমার হাতে সমর্পণ করেছিল তার কারণ ও প্রথম যুগে আমার মধ্যে হয়তো একটা চটকের সন্ধান পেয়েছিল। কিন্তু ঠিক চটকও হয়তো সেটা নয়। আমার মধ্যের অকৃত্রিম মানুষটির পরিচয় নিতে চায়নি ও কোনদিন, তবু যেদিন আমার ভেতরের রূপটা দেখলে ও সেদিন তো কৈ ওর ভালবাসা মিইয়ে গেল না। ক্ষমা করলে ও আমাকে।

অথচ আমি নিজে বহুবার চেষ্টা করেছি আমার স্বরূপ প্রকাশ করার। আমার মধ্যে গুণগরিমার কাণাকড়িও যে নেই এইটুকু প্রমাণ করতে গিয়ে

বিনয়াধিক্যে নিজেকে তার কাছে আরো বড়ো ক'রে তুলেছি। উৎপলা বুঝতে বা দেখতে চাইতো না।

একবার বলেছিলাম, তোমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেও বোঝ না কেন আমি সাধারণ মানুষেরই একজন।

উৎপলা হেসে হাল্কা ক'রে দিয়েছিল কথাটা।—তুমিই বা বোঝ না কেন, চোখে আঙুল দিলে চোখ জ্বালা করে, জল পড়ে, দেখতে পাওয়া যায় না মোটেই।

আর একটা দিনের কথা মনে আছে। উৎপলাদের বাড়ীতে একটা গানের আসর হয়েছিল সেদিন। অডিকলোনের শিশির মত অস্বাভাবিকতায় গড়া ডজন কয়েক মেয়ে রঙবেরঙের সাড়ি দুলিয়ে রামধনু ছড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। সুজিতের আত্মীয়ার বন্ধু এই উৎপলা। তাই আমার নিমন্ত্রণ এসেছিল সুজিতের মারফৎ। আগেই বলেছি, কাঞ্চীর কথা শুনিয়ে শুনিয়ে কান ঝালাপালা করে দিলেও উৎপলার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কত ঘনিষ্ঠ তা জানতে দিইনি সুজিতকে।

সুজিতের চোখ ফাঁকিয়ে ট্যাপ ড্যান্সের মত খুটখুট শব্দ উঁচিয়ে উৎপলা আমাকে টেনে নিয়ে গেল ছাদের এক কোণে। কথায় কথায় সেই পুরোনো কথাটাই ফিরে এলো।

উৎপলা বলেছিল, মানুষ, আসল মানুষ, এসব বুঝতে চাই না। সেভাবে মেয়েরা চেনে এক মাত্র স্বামীকে। কিন্তু ভালোবাসার পাত্র যে, তার ঘাড়ে গুণ না থাকলে কল্পনা ক'রে নিতে হয়, বুঝলে?

—বুঝতে পারছি কি পারছি না, সেইটেই বুঝতে পারছি না।

উৎপলা খিলখিল ক'রে হেসে উঠেছিল।—সেইজন্যেই তো পৃথিবীর সকলের চেয়ে তোমাকে বুদ্ধিমান মনে হয়। কোন লোকটাই পৃথিবীর জনে না যে সে কিছুই জানে না। তুমি জানো যে তুমি কিছুই জানো না।

বলেছিলাম, বাজে কথা থাক। এইটুকুই বুঝলাম যে তুমি আমাকে ভালবাসো না, ভালবাসি মনে করতে ভাল লাগে ব'লে—

উৎপলা উত্তর দিয়েছিল, বাঃ রে-ভালবাসা মানেই তো তাই। তুমি কি চাও যে তোমার নাক আর দাঁত ভালবাসবো, আর যে দিন নাকটা ভাঙবে কি দাঁতটা নড়বে সেদিন সব সম্পর্ক শেষ হবে?

উৎপলার কথা শুনে আমার চিরকালই মান হয়েছে, ওর ভালবাসাটা মিথ্যে কিন্তু কথা বলার ঢঙটুকু সত্যি। ভেবেচিন্তে কথার উত্তর দিত না ও। স্বতঃস্ফূর্ত ওর কথা। ডানা দুলিয়ে যারা উড়ে বেড়ায়, বাক্যের ভাঁজে সুর বুলিয়ে বেটোফেন মেনে কথা বলে, উৎপলা সে দলের নয়। আবার কালচার-হীন কাঞ্চনলোভী কাঞ্চীর দলেরও নয়।

কিন্তু এমন একটা দিন এলো, যেদিন বুঝলাম কাঞ্চী আর উৎপলার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। শুধু একটু সোনালী জৌলুষ ছিল উৎপলার সর্বাঙ্গে, চোখে আর মুখে। স্থান-কালের প্রভাবে তাই কাঞ্চীর সঙ্গে মিলে যেতে সময় লাগলো না উৎপলার। ল্যাবরেটরীতে পারার পাত্রে খাঁটি সোনা ডুবিয়ে দেখেছি মুহূর্তে রূপালী রং ধরেছে তার গায়ে। উৎপলার অন্তরটা খাঁটি সোনাই হোক্ আর গিল্টিই হোক্ অভিশাপের মার্কারী লেগে সেও একদিন কাঞ্চী হয়ে উঠলো।

এমন দুঃখের সময়ও লজ্জা এসে বাধা দিয়েছিল ওকে।

এম. এস.-সি. পরীক্ষা তখন শেষ হয়ে গেছে। নিরুদ্দেশ হয়েছিলাম। বহুদিন পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, উৎপলার বিয়ে হয়ে গেছে। দেখা করেছিলাম। ক্ষমা পেয়েছি।

উৎপলাকে বিয়ে করিনি তার কারণ আমার বৈজ্ঞানিক মনটা সহানুভূতি দেখায়নি। ইস্পাতের বাঁধাধরা লাইনের ওপর দিয়ে যখন আমার জ্ঞানা-হরণের চাকাটা ধীরে মন্থরগতিতে এগিয়ে চলছিল, তখন জেনেছিলাম, হাইড্রোজেন দু'ভাগ আর একভাগ অক্সিজেন মিলে হয় জল। প্রেম জিনিসটাও ভাগ করা যায় এই একই নিয়মে। প্রেমের রসায়নাগারে অক্সিজেনরূপে দেখা দেয় মন। বাকীটা সেবা আর দেহ। সেবা করতে গেলে হাত-পা নাড়তে হয় এবং হাত-পা দেহেরই অঙ্গ। অতএব দু'ভাগ দেহ ও একভাগ মন মিলে প্রেম, বিবাহিত প্রেম, স্বামী-স্ত্রীর প্রেম। তাই মনে হয়েছিল উৎপলাকে বিয়ে ক'রে সুখী হ'ব না, কারণ হাইড্রোজেনকে দু'ভাগ থেকে দশভাগে বাড়ালেও বিনা অক্সিজেনে এক ফোঁটা জলও দেখা দেয় না।

অবশ্য উৎপলার বিয়ে হয়ে যাওয়ায় লেগেছিল একটু বুকে। পুরনো আসবাব বিক্রী ক'রেও তো মানুষের কষ্ট হয়। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে অন্ত

কাউকে সহধর্মিণীর আসন না দিয়ে ভুল করেছি। সুজিতও আজ কাকীকে ভুলেছে, 'থুতু' পাগলীকে চিনতে পারছে না, সংসারের সুখ লুটছে। স্ত্রী দূর্বা দেবীকে সিনেমা দেখাচ্ছে, অমিতাভের জন্তে খাবার কিনছে। অমিতাভ! দূর্বা দেবীর একান্ত অনুরোধে ছেলেটির নামকরণ করতে হয়েছিল আমাকেই।

গল্প আমার এখানেই শেষ। একটা কথা শুধু আগাগোড়া গোপন ক'রে গেছি।

উৎপলার আসল নাম দূর্বা।

মনবন্দী

তাঁর পুরো নামটা জানবার সৌভাগ্য হয়নি কোনদিন। শুধু এইটুকু জানি যে, তখন তিনি কুমারী ছিলেন, উপাধি ছিল 'সেন'। পরে শ্রীমতী হয়েছিলেন, উপাধি হয়েছিল ভট্টাচার্য। প্রথম দেখেছিলাম ডাউন দিল্লী এক্সপ্রেসের থার্ড ক্লাস কামরায়। রাতের ট্রেনে কখন কোন্ ষ্টেশন থেকে যে উঠেছিলেন লক্ষ্য করিনি। লক্ষ্য করবার উপায়ও ছিল না।

পুজোর ভিড় তখন। থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে যদিও লেখা ছিল 'বত্রিশ জন বসিবেক', তবু জন পঞ্চাশেক লোক ঢুকেছিল কামরায়। আর যত না যাত্রী, তার পাঁচগুণ ছিল বাক্স-বিছানা, লটবহর, খাবারের চ্যাঙাড়ি মাটির কুঁজো, নতুন কুলো, ছাতা, লাঠি। নীচের বেঞ্চি, উপরের বাঙ্ক থেকে বাড়তি ভীড়টা উথলে এসে পড়েছিল দরোজার কাছে। তারই মধ্যে দরোজার জানালায় মাথা গলিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলাম আমি, আর আমার এক মুসলমান বন্ধু।

মাঝে মাঝে জানালায় মাথা গলাই, আর মাঝে মাঝে কচ্ছপের মত সুড়ুৎ ক'রে গলাটা টেনে নিয়ে শিড়দাঁড়ার টনটনে ব্যথা ভাঙাই। আর তারই ফাঁকে দু-একটা আজেবাজে কথা চলে বন্ধুটির সঙ্গে।

এমন সময় হঠাৎ বন্ধুটি ফিসফিস ক'রে বললে, ভদ্রমহিলা বোধ হয় কিছু বলতে চান—তোমাকে।

ভদ্রমহিলা? ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, সত্যিই তাই। বেঞ্চির এককোণে ইঞ্চি ছয়েক জায়গায় কোনরকমে ব্যালান্স রক্ষা ক'রে বসে আছেন একজন ভদ্রমহিলা। ভদ্রমহিলা বলব, না তরুণী? একহারা লম্বা ছিপছিপে চেহারা, বয়স হয়তো ছাব্বিশ। কিন্তু এই বয়সেই চোখেমুখে ছত্রিশ বছরের ক্লান্তি।

শরীর সম্পর্কে কোন যত্ন না নিলে এবং অত্যধিক দুশ্চিন্তায় মুখের চামড়ায় যেমন এক ধরণের খসখসে ভাব ফোটে, তরুণীটির মুখেও সেই ছাপ দেখলাম। দুহাতে একরাশ জিনিষপত্তর। একটা ছোট এ্যাটাচি কেস, আরও কী কী যেন জড়িয়ে ধরে বসেছিলেন তিনি। আর চোখজোড়া কি যেন বলতে চাইছিল।

বার তিনেক চোখাচোখি হওয়ায় হঠাৎ বললেন, শুনুন।

এগিয়ে গেলাম।

—আপনি তো বাঙালী ?

বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তবু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ? উষ্মা প্রকাশ পেলো এবার।

বললাম, কেন বলুন তো ?

—বাঃ দেখতে পাচ্ছেন না কত অসুবিধে হচ্ছে ? এভাবে কেউ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে পারে ?

মনে মনে ভাবলাম, কি আশ্চর্য, এই ভীড়ের মধ্যে যে বসবার জায়গা পেয়েছেন এইতো যথেষ্ট। আর আমি নিজেই যখন এত কষ্ট সহ্য ক'রে এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি, তখন অপরের সুখসুবিধের দিকে চোখ না গেলেই বা কি অন্যায়। সারা গাড়ীতে আর কেউ বাঙালী নেই ব'লেই কি সব দায়িত্ব আমার নাকি !

তবু সুর নামিয়ে বললাম, কি করব বলুন।

বিরক্তির স্বরে উত্তর এল, কেন ঐ যে ওদিকের বেঞ্চে হাত-পা ছড়িয়ে সংসার পাতিয়ে বসেছেন ওঁরা, ওঁদের তো একটু বলতে পারেন।

তাকিয়ে দেখলাম কথাটা মিথ্যে নয়। ট্রেন ছাড়বার মুহূর্তে ওদিকটা একেবারে ভিড়ে ঠাসা ছিল, তারপর দু-একজন নেমে গেছে, অথচ তাদের জায়গাগুলো দিব্যি দখল ক'রে বসেছে মোটা চেহারার মাড়োয়ারী গিন্নীটি, নথ নেড়ে নেড়ে গল্প জমিয়ে তুলেছে, ছেলেমেয়েগুলোও।

হাজার হোক্ স্বদেশবাসী, তাই অনেক কাকুতি মিনতি ক'রে জায়গা ক'রে দিলাম ভদ্রমহিলার জন্যে। বিদেশ-বিভুঁই থেকে ফিরছেন, আর নেহাৎ বিপদে পড়েই না সাহায্য চেয়েছেন। মনে মনে একটু বেশ খুশীই হলাম এ কারণে, অপরিচিতা কোন মহিলার উপকার করতে পারলে একুশ বছরের রোমান্টিক মন যেমন খুসী হয়।

কিন্তু সেই যে উটের গল্প আছে না, নাক বাড়াতে দিলে সারা শরীরটাই ঘরে ঢোকায়, আমার অবস্থাও হ'ল তাই। মিনিট পাঁচেক যেতে না যেতেই নারীকণ্ঠের আদেশ এল—

—দেখুন, এই জলের ফ্লাস্কটা আপনি ধরুন তো, এতগুলো জিনিষ সাম্‌লানো যায়!

এ ধরনের কথাকে অনুরোধ বলা যায় না, আদেশই বলতে হয়। আর এ আদেশের মধ্যে কি যেন আছে, উপেক্ষা করা যায় না, উত্তর দেওয়া যায় না, শুধু হুকুম মানতে হয়। সুতরাং জলের ফ্লাস্কটা আমাকেই কাঁধে ঝোলাতে হয়।

একটু পরেই আবার—এই থলিটা আপনার পায়ের কাছে রাখবেন? এখানে একরত্তি জায়গা নেই।

এইভাবে একটার পর একটা হুকুম মানতে মানতে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, ভদ্রমহিলার যাবতীয় সংসার আমার কাঁধে-কোলে ভর করেছে। অথচ বসতে পাওয়া তো দূরের কথা, তখনও পর্যন্ত ভালো ক'রে দুটো পা রাখবার জায়গা পাইনি, এক-ঠেঙা বকের মত দাঁড়িয়ে আছি।

এমনি সময় হঠাৎ একটা ষ্টেশনে মিনিটখানেকের জন্যে গাড়ি দাঁড়াল। গর্ম্ সিঙাড়া থেকে চায় গর্ম অবধি নানা গানের ধুয়ো শেষ হ'তেই গাড়ি ছেড়ে দিল আবার।

আর সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলা আঁৎকে উঠলেন যেন।—ওকি, চা ডাকলেন না? আবার কখন থামবে ঠিক নেই, আপনি কি বলুন তো?

আমি যে কি বস্তু, সে বিষয়ে আমার নিজেরই সন্দেহ হতে শুরু হয়েছে তখন।

তবু ঠাণ্ডা মেজাজেই বললাম, পরের স্টেশনেই বলব।

শুধু একটা কথা বলতে পারলাম্ না যে, আমার নিজেরও চা-পানের ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু ভদ্রমহিলা তাঁর সারা সংসারটা আমার ঘাড়ে চাপানোয় সে আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে রেখেছি।

যাই হোক্, পরের স্টেশনে জানালায় গলা বাড়িয়ে একটা চা-ওয়ালাকে ডেকে দিলাম, ভদ্রমহিলা এক ভাঁড় চা-ও নিলেন। আর জিনিসপত্তর নামিয়ে রেখে কোনরকমে হাতটা বাড়াব আর এক ভাঁড় চায়ের জন্যে, ভদ্রমহিলা চীৎকার ক'রে উঠলেন, না না আমি দিচ্ছি, আমি দিচ্ছি। আপনি দেবেন না।

সুতরাং ভদ্রমহিলা যে ভুল করেননি, এইটুকু বোঝাবার জন্তেই পকেটে হাত দিয়ে পয়সাটা দিয়ে দিতে হ'ল চা-ওয়ালাকে এবং নিজের চা নেবার আগেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

আবার কিছুক্ষণ বেশ চুপচাপ কাটল।

হঠাৎ।—শুনুন, এ ভিড়ে আমি থাকতে পারব না। পরের স্টেশনেই আমাকে লেডীজ কম্পার্টমেণ্টে তুলে দেবেন।

এবারে আপত্তি করতেই হ'ল, কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনবেন না। অগত্যা দেড় মিনিটের স্টপেজে লটবহর এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ছুটতে ছুটতে যেতে হল। ভিড়ে ঠাসা লেডীজ কামরায় এক রকম ঠেলে তুলে দিলাম তাঁকে। আর রেহাই পাওয়া গেছে ভেবে যেই না স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা অমনি······

—প্রত্যেক স্টেশনে এসে খোঁজ নিয়ে যাবেন কিন্তু।

ঘাড় নেড়ে সায় জানিয়ে নিজের কামরায় ফিরে এসে হাত-পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়েছি অমনি উপরের বাঙ্ক্ থেকে খোনা সুরের ডাক শুনলাম।—ও মশয়।

ফিরে তাকিয়ে দেখি, এতক্ষণ বিছানার বাণ্ডিল ভেবে যেটাকে ভুল ক'রে ছিলাম সেটা আসলে মানুষ। বুড়ো লোকটি এবার উঠে বসল গায়ের চাদরটা সরিয়ে। কপালে চন্দন না গঙ্গা-মৃত্তিকার তিলক, গলায় কণ্ঠি, শরীরে চামড়ার লাইনিং দেওয়া কয়েকখানা হাড়।

বৃদ্ধ উঠে বসে নাকি সুরে বললেন, আমাদের মিস সেনকে কোথায় তুলে দিয়ে এলেন বলুন না?

মিস সেন? নিজেই বিস্মিত হলাম। বললাম, আপনার পরিচিত নাকি?

আদরে-গলে-যাওয়া শিশুর মত নাকি সুর বেরুল আবার।—হ্যাঁ, আমাদের ইস্কুলের টিচার উনি, আর আমি হেডপণ্ডিত। আমার সঙ্গেই আসছিলেন কিনা।

গলার স্বরে ক্রোধ প্রকাশ ক'রে বললাম, আমার সঙ্গেই আসছিলেন কিনা। তা এতক্ষণ বলেননি কেন?

বুড়ো ফোক্‌লা মাড়ি বের ক'রে হাসলে।—ভাবলাম আপনি বিরক্ত হবেন তাই, তা একটু বলুন না, কোন্ কামরায় গেলেন, একবার দেখা ক'রে না এলে যদি সেক্রেটারীকে দরখাস্ত ক'রে দেন।

সুতরাং তাঁকে পরের স্টেশনেই নিয়ে যেতে হ'ল লেডীজ কম্পার্টমেণ্টে।

আর পণ্ডিতমশাইকে দেখেই একমুখ হেসে মিস সেন আমাকে হুকুম দিলেন, শুনুন, উনি রইলেন আপনাদের গাড়িতে, একটু দেখাশোনা করবেন। বুড়ো মানুষ, একটু হাত-পা ছড়িয়ে বসবার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।

তথাস্তু।

ভাবলাম, গল্পে তো পড়েছি উটটাই ঢুকেছিল ঘরের ভিতর, আবার একজন সঙ্গী ডেকে এনেছিল তা তো শুনিনি।

যাই হোক্ দুর্ভোগ বেশি পোয়াতে হ'ল না। ট্রেন এসে পৌছিল গন্তব্যে। আর মিস সেনের জিনিসপত্তর কুলির মাথায় তুলে দিয়ে সুড়ুৎ ক'রে সরে পড়ছি, তার আগেই।—পণ্ডিতমশাইকে পাঁচ নম্বর বাসে তুলেদিয়ে তারপর যাবেন যেন!

তারপর বহুদিন আর দেখা হয়নি মিস সেনের সঙ্গে।

বছর তিন-চার পরে ভাইঝিকে ইস্কুলে ভর্তি করতে গেছি। দেখি হেড মিস্ট্রেস হয়ে যিনি বসে আছেন, তাঁর মুখটা কেমন যেন চেনা-চেনা। আর আমাকেও বোধ হয় চিনতে পারলেন তিনি।

বললেন, আপনাকে যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে!

বললাম, আমারও।

কিন্তু বহু চেষ্টা ক'রেও মনে পড়ল না। যথারীতি ভর্তি করার কাজ সেরে চলে আসব, হঠাৎ হেড মিস্ট্রেস বললেন, আমার জন্যে একটা কম ভাড়ার ভালো ফ্ল্যাট খুঁজে দিন তো।

ব্যস। সঙ্গে সঙ্গে সেই আদেশের সুরটা মনে পড়ে গেল।

বললাম, আপনি তো মিস সেন? সেই যে ট্রেনের কামরায় দেখা হয়েছিল······

আরও দু-চার কথা স্মৃতিরোমন্থনে মিস সেনেরও মনে পড়ল। হেসে বললেন, আমি এখন মিসেস ভট্টাচার্য।

বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে বললেন, আসবেন একদিন, আপনাকে দিয়ে আমার অনেক কাজ করাতে হবে।

ভয় পেয়ে গেলাম। কেমন স্পষ্ট কথা। তবু ভাগ্য বলতে হবে যে, তখনই কোন ফরমাশ দিয়ে বসলেন না মিস সেন, মানে মিসেস ভট্টাচার্য। ফরমাস দিলেন না সে-কথাই বা বলি কি ক'রে।

সবে আপিসঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাইরে পা দিয়েছি, অমনি শুনতে পেলাম, —আসবেন কিন্তু, আর ঐ সঙ্গে একটা ভালো ফ্ল্যাটের খবর নিয়ে আসবেন।

প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আর ও-পথে নয়। এমন কি ভাইঝিকে ও ইস্কুলে রাখবো না এমন বাসনাও জেগেছিল।

কিন্তু অদৃষ্ট খণ্ডাবে কে! একটা টুথ ব্রাশ কিনতে গিয়ে পাড়ার স্টেশনারি দোকানটায় দেখা হয়ে গেল।

একমুখ হেসে মিসেস ভট্টাচার্য বললেন, খুব এলেন তো। চলুন, কয়েকটা জিনিস কিনে নিয়ে একটু গল্প করা যাবে।

শঙ্কিত হয়ে পকেটে হাত দিলাম। কিন্তু না, দাম নিজেই দিলেন তিনি। তারপর এক পা হাঁটেন তো তিন মিনিট দাঁড়ান। বাঃ, চমৎকার কাপগুলো তো। কত করে? আট আনা? এই বাজে কাপ? তারপরই দু-পা হেঁটে, ডিম কত ক'রে জোড়া? আবার দু-পা এগিয়ে, ক্লিপ আছে? চুলের ক্লিপ? এক-পা এগিয়ে, দেখি এক প্যাকেট ন্যাপথলিন। আবার খানিকটা গিয়েই, বেলফুলের মালা কত ক'রে? দাও একটা। তারপর শো কেসের সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ শাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকা।

পাক্কা দেড় ঘণ্টা। কোমরে ব্যথা, পা টনটন।

শেষকালে মিসেস ভট্টাচার্য বললেন, চলুন আমাদের বাসায়।

গেলাম। অর্থাৎ যেতে হ'ল।

ছোট দু-কুঠরির ফ্ল্যাট। এক ফালি বারান্দাই রান্নাঘর।

একটা ইজি চেয়ারে একজন বৃদ্ধ বসেছিলেন। চিনতে পারিনি তাঁকেও।

মিসেস ভট্টাচার্য আলাপ করিয়ে দিলেন সহাস মুখে।—ইনিই মিস সেনকে মিসেস ভট্টাচার্য করেছেন। আর এঁকে তো তুমি দেখেছ, সেই যে একবার পূজোর ছুটিতে ট্রেনে...

—বসুন। নাকি সুর শুনেই মনে পড়ে গেল। বাঙ্কে ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকা পণ্ডিতমশাই, যিনি সেক্রেটারীর কাছে দরখাস্ত ক'রে দেবে এই ভয়ে মিস সেনের খবর নিতে নেমেছিলেন!

কেনা-কাটা জিনিসগুলো নামিয়ে রেখে মিসেস ভট্টাচার্য স্বামীর তদারকিতে মন দিলেন। পায়ের ব্যথাটা কমেছে একটু? তেলটা মালিশ ক'রে দেব?

পণ্ডিতমশাই 'না না' ক'রে উঠলেন।

মিসেস ভট্টাচার্য তবু শান্ত হলেন না।—দাঁড়াও মিকশ্চারটা এনে দিই—ব'লে ওষুধের শিশি-গেলাস নিয়ে এলেন।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম এবং ভালো করে লক্ষ্য করবার সুযোগ পেলাম পণ্ডিতমশাইকে। রোগা হাড়-জিলজিলে শরীরে ধোপদুরস্ত আদ্দির পাঞ্জাবি, জরিপাড় শান্তিপুরী ধুতি, হাতের দশটা আঙুলে আটটা আংটি, সোনার রিস্টওয়াচ, পায়ে লাল মখমলের চটি। সে এক কিম্ভূত চেহারা।

ইতিমধ্যে ওষুধ খাইয়ে পদসেবা শুরু ক'রে দিয়েছেন মিসেস ভট্টাচার্য। মালিশ শেষ ক'রে খাবারের থালা নিয়ে এসে আসন পেতে দিলেন, তারপর পণ্ডিতমশাইকে ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেন।

তারপর ছোট ছেলেদের মা যেভাবে খাইয়ে দেয় ঠিক সেইভাবেই পণ্ডিত-মশাইয়ের মুখে খাবারের গ্রাস তুলে দিতে শুরু করলেন মিসেস ভট্টাচার্য।

শেষে কাজ সেরে হাতমুখ ধুয়ে এসে বসলেন।

পণ্ডিতমশাইকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, এ বাসাটা তোমার ভাল লাগছে না বলছিলে, তা এঁকে বলেছি একটা ফ্ল্যাট খুঁজে দিতে।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, একটু তাড়াতাড়ি খুঁজে দেবেন বুঝলেন।

আরও দু'এক কথার পর উঠে গেলেন। আশা করেছিলাম, এক কাপ চা অন্তত আসবে। কিন্তু তাও এল না।

কিছুক্ষণ পরে উঠে চলে আসছি, হঠাৎ মিসেস ভট্টাচার্য সামনে এসে দাঁড়ালেন, ও কি চলে যাচ্ছেন? ও একা থাকবে ব'লে বসিয়ে এলাম। যান একটু গল্পগুজব ক'রে ভুলিয়ে রাখুন ওঁকে, আমি পরীক্ষার খাতাগুলো দেখে নিই।

সুতরাং ফিরে এসে বসতে হ'ল। ঘণ্টাখানেক পরে দেখা দিলেন মিসেস ভট্টাচার্য, নতুন ফ্ল্যাট খুঁজে দেওয়ার হুকুম জানিয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

বললাম, দেখব। কিন্তু ওঁর জন্যে তো আপনাকে খুব খাটতে হয় দেখছি।

মিসেস ভট্টাচার্য হাসলেন।—কী যে বললেন, ওঁর জন্যেই তো আজ ইস্কুলের টিচাররা আমাকে এত মান্য করে, ঈর্ষা করে, তা জানেন?

ঈর্ষা করে। কথাটা শুনে আপনা থেকেই চোখ গেল মিসেস ভট্টাচার্যের সিঁথির সিঁদুরের দিকে।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু একটা প্রশ্ন জাগল মনে। মানুষ সুখী হতে চায়? না সুখে আছি, এ কথা জানিয়ে সুখী হয়?

রেবেকা সোরেনের খবর

আশেপাশের পাঁচটা কোলিয়ারির ভিড় ভেঙে পড়লো কারানপুরার বুকে। কারানপুরা—যার আদি নাম কর্ণপুর।

কিংবদন্তী শোনা যায়, মহাভারত-চরিত্র কর্ণের রাজধানী ছিল এটা। তুসাদ তুবে মাহাতো সিংরা শুধু বলেই খালাস নয়। পাহাড়ের গায়ে এক সারি প্রাচীন গুহার দিকে আঙুল দেখিয়ে জানায়, কর্ণের দরবার। আর অরণ্যচর বীরহড়দের যে দলটা তীর ছোঁড়ার সময় বুড়ো আঙুলটা মুড়ে রাখে তাদের দেখিয়ে বলে, একলব্যের বংশধর ওরা।

কে কি বলছে না বলছে, জংলা ডেরার সাস্তালরা অবশ্য তার খোঁজ রাখে না। খোঁজ রাখে না, তবে রাখে কান। ঢেঁড়া কাঠির ডুগডুগির দিকে। সে ডুগডুগি মাঝে মাঝে জানিয়ে দেয়, লোক লাগবে বাঁশরিয়ার খাদানে, কিংবা নাটুয়া দল তাঁবু ফেলেছে ঝিনকাগাড়ায়।

এমনি এক ডুগডুগির ডাক শুনেই মেয়েমরদের ভিড় ভেঙে পড়লো কারানপুরার রামলীলার মাঠে।

ভিখারিয়ার নাচ এসেছে, ভিখারিয়ার নাচ। নামে নাচ, আসলে গান। কানে আঙুল দেওয়া কবিগানের লড়াই। যা শোনবার আগ্রহে আঠারো ক্রোশ পথ হাঁটতেও উৎসুক হয়ে উঠে দেহাতীরা, কোলিয়ারির চড় হো ভুল্গি খাড়িয়া রেজাকুলির দল।

তাই ডুগডুগি শুনতে না শুনতে প্লাবন নামলো রামলীলার মাঠে, কুলি কামিন আর জোয়ান সাওতা, বাচ্চা বুড়ো হাড়াম হপন্, সবাই।

ভিড়ের মুখে গা ভাসিয়ে রূপমতীও এসে পৌঁছলো। পৌঁছলো যখন, তোতা আর ম্যার ভিখারিয়া ছাড়েনি তখনও।

'ভিখারিয়া হ'ল গ্রামের নাম, তা থেকে ভিখারিয়ার নাচ।' বোঝালেন কারানপুরা কোলিয়ারীর কম্পাসবাবু।

মারাঠী ম্যানেজার সাঠে সাহেব মাথা নাড়লেন। ও তল্লাটের চীফ মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার ডিকসন আর এজেন্ট ফার্নহোয়াইট চুরুট চাপা ঠোঁটে বললেন, আই সী!

সব কৃতিত্বটুকু কম্পাসবাবুই নিয়ে নিচ্ছেন দেখে কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে এলেন মিশ্রীরজী। বললেন, তোতা পাখী আর ময়ূর সেজে দু'জন লোক আসবে এখনি, নাটকটার কাহানী ব'লে দেবে।

কাহানী? ফার্নহোয়াইট ভুরুতে প্রশ্ন তুলে তাকালেন।

ঠিকাদার সাহানা বললেন, কাহানী না ছাই। ভিলেজ স্ক্যাণ্ডাল, যত সব কেচ্ছা ভিন গাঁয়ের মেয়েদের নামে। ছড়া বেঁধে গাইবে ওরা, আর পারে তো সে গাঁয়ের লোক জবাব দেবে গান গেয়ে। না পারে তো লাঠিসোটা নিয়ে হৈ হৈ ক'রে উঠবে।

মিশ্রীরজী সায় দিয়ে বললেন, হ্যাঁ স্যার। ভিখারিয়ার নাচ হয়েছে অথচ দু'চারটে খুন-জখম হয়নি এমন ঘটনা আমরা অন্তত শুনিনি।

বলতে না বলতেই হৈ হৈ চীৎকার উঠলো ওদিক থেকে।

না। মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামার ব্যাপার নয়। তোতা আর ম্যোর দেখা দিয়েছে বাঁশ দিয়ে ঘেরা আসরের মাঝখানটিতে। তোতার মাথায় সাদা পালকের ঝুঁটি, ম্যোর অর্থাৎ ময়ূরের পেখম আঁটা আরেকজনের বুকে পিঠে। হঠাৎ দেখলে ভয় পাবার মত চেহারা হয়েছে দু'জনেরই। দু'জনেই সুর ক'রে গান সুরু করেছে। মূল গায়েন যতক্ষণ না এসে পৌছয় দলবল নিয়ে ততক্ষণ আসর জমিয়ে রাখার দায়িত্ব এদের।

তোতা আর ম্যোরকে আসতে দেখেই আনন্দে হৈ হৈ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠেছে কুলিকামিন কোড়াকুড়ির দল।

বাঁশের বাতা দিয়ে ঘেরা আসরের চারপাশে উবু হয়ে বসা নোংরা জনতার ভিড় যে কতদূর অবধি ছড়িয়ে গেছে ঠাহর হয় না। আর জনতাকে ঘিরে এক সারি ফার্নেসের মত বড় আগুনের কুণ্ড। কারানপুরার খাদানে কয়লা থাকতে শীতে কাঁপবে কেন লোকগুলো, ফার্নহোয়াইট তাই পঁচিশ বাকেট কাঁচা কয়লা স্যাঙশন করেছেন। অগ্নিকুণ্ডের মত দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে

সেগুলো, আসরকে চারপাশ থেকে মালার মত ঘিরে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী তো নয়, যেন সিন্ধবাদের কুড়িয়ে-পাওয়া হাঁড়ি থেকে দুলে দুলে উঠছে এক একটা দৈত্য।

দেহাতীদের থেকে খানিকটা দূরত্ব রেখে বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে বসে বসে দেখছিলেন ফার্নহোয়াইট, ডিকসন, সাঠে আর ঠিকাদার সাহানা। শেষ জনের ইঙ্গিতেই কে যেন সামনের টুলে দু' বোতল হুইস্কি আর আনুষঙ্গিক রেখে গেল।

ফার্নহোয়াইটের কিন্তু সেদিকে চোখ ছিল না। দোষও দেওয়া যায় না। কাছে-পিঠে রূপমতীর মত মেয়ে যৌবন কাঁপিয়ে ঘুরে বেড়ালে কি অন্যদিকে চোখ যায়!

সান্তালদের ভিড়ে এমন মেয়ে? আশ্চর্য হয়েই তাকিয়েছিলেন ফার্নহোয়াইট। আর তা লক্ষ্য ক'রেই সাহানা ফিসফিস ক'রে বললেন, রূপমতী! আমাদের তিন নম্বর খাদে কাজ করে মেয়েটা।

রূপমতী। ফার্নহোয়াইটের বাউণ্ডুলে ছেলেটা যার পিছনে ছায়ার মত ঘুরতে চায়।

খাদানে নেমে আজ মাটিকাটারি প্লটে, কাল মাল-কাটারিদের কাছে-পিঠে ঘুরঘুর করা, মেয়েপুরুষ কারো চোখ এড়ায়নি। কানাঘুষো ফিসফিস, চোখে হাসি, মুখে আঁচল-চাপা কৌতুক বোধ করেছে রেজামেয়ের দল। সবাই লক্ষ্য করেছে কার খোঁজে জল-কাদা ডিঙিয়ে কালো কয়লার অন্ধকূপে নেমে আসে ম্যাকু। লক্ষ্য ক'রে দেখেছে, রূপমতী যখন মাল-বোঝাই ঝুড়িতে ঝাঁকানি দিয়ে সেটা মাথায় তুলে ফিরে দাঁড়ায় আর চোখোচোখি হয় ম্যাকুর সঙ্গে, তখন হঠাৎ যেন তৃপ্তির ঝর্ণা নামে বাউণ্ডুলে সাহেবটার মুখে-চোখে। আর, আর রূপমতীও বোধ হয় ছোকরা সাহেবের এই নির্লজ্জ পাগলামি দেখে ফিক্ ক'রে হেসে ফেলেই মুখ গম্ভীর করে।

কিন্তু দিনের পর দিন এমনি একভাবে আসা, দেখা হওয়া, হাসি, কৌতুক......কেমন যেন নেশা ধরে যায় রূপমতীর। ঝুড়িটা উল্টে নিয়ে তার ওপর বসে পা ছড়িয়ে একদিন লালোয়া কুড়ুখের সঙ্গে গল্প না করতে পেলেও বোধ হয় মন খারাপ হয় না রূপমতীর। মন খারাপ হয় দৈনন্দিন নেশা না মিটলে।

এদিকে কানাঘুষো হাসাহাসি থেকে ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে, বেশ টের পাচ্ছিল রূপমতী। পট্টির বুড়াবুড়িরাও বলা-কওয়া সুরু করেছিল।

লালোয়া কুড়ুখও বেজাত, কিন্নির মিল নেই। তবু তাকে নিয়ে রটনার মৌমাছি বেশী গুণগুণ করে না। যত আপত্তি ম্যাকুসাহেবের বেলা।

সাহেব। ও হ'ল আমাদের শত্রুর জাত। চান্দো বোঙা পাপের জল ছিটিয়ে দিয়েছে ওদের ওপর। ধরম নাই ওদের, তাই সান্তালদেরও ধরম নষ্ট করতে এসেছে ওরা। চান্দো বোঙার কাছ থেকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে খিস্টেন করে দেয় ওরা। যেমন করেছে ঐ মরিয়ম, সেবাস্তিনা, মেরিয়া, রোজিকে।

তাই রূপমতীকেও সাবধান ক'রে দিয়েছিল পট্টির সর্দারনী, মুণ্ডা গিতিওড়ার কুড়িমেয়েরা, ওঁরাও ধুমকুড়িয়ার কুমারী মেয়ের দলকেও।

আর সান্তাল পাড়ার ছিমছাম মেয়ে সোনা মিরু কানে কানে রূপমতীকে বলেছিল, বুড়ারা নজর রাখছেন তুয়ার পানে।

সোনা মিরুর এই সাবধান-বাণী শুনেই ভয় পেয়ে গেল রূপমতী। বুড়োরা নজর রাখছেন! কেন, তা রূপমতী ভালো ক'রেই জানে।

বিটলা!

চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠেছিল বছর খানেক আগের একটি দৃশ্য।

বিটলা হওয়ার পর তিলে তিলে শুকিয়ে মরতে দেখেছে ও সেবাস্তিনার মাকে। পঞ্চায়েতের ভয়ে ওঁরাও মুণ্ডারাও কথা বলতো না, এক পয়সার তেল কি নুন কিনতে পেতো না শনিচারীর হাটে। অশ্লীল ঠাট্টা-বিদ্রূপ, নোংরা অঙ্গভঙ্গী ক'রে তাকে পাগল ক'রে তুলতো বারো বছরের বাচ্চাগুলোও। আর, আর—

ভাবতেও শিউরে ওঠে রূপমতী।

জোয়ান বুড়ো সবাই ধরম অধরম ভুলে হল্লা বাধাতো তার ডেরায়, রাতে বিরেতে।

লাজশরমের বালাই ছিল না লোকগুলোর।

তাই কারও দিকে চোখ তুলে তাকাতেও ভুলে গিয়েছিল রূপমতী।

এক শুধু চুপচাপ দেখাশোনা লালোয়া কুড়ুখের সঙ্গে। দু' কুড়ি টাকা জমলেই চলে যাবে কুমাণ্ডির খাদানে। দু'জনে বাসা বাঁধবে সেখানে। বিটলার ভয়ে কাঁপতে হবে না।

সন্ধ্যে পার না হতেই পট্টির পথ ধরতো ও, সাহস হ'ত না আগের মত ম্যাকুসাহেবের সঙ্গে রয়ে বসে রসিকতা করতে। মান্‌কির হুকুম না নিয়ে যেত না আড্ডায়, আখড়ায়। কিন্তু ভিখারিয়ার ডুগডুগি উপেক্ষা করতে পারলো না ও। এসে হাজির হ'লো তাই রামলীলার মাঠে।

ভিড় থেকে উঠে এসে সটান গিয়ে দাঁড়ালো ও মিঠাপানির দোকানটার সাম্‌নে। লাল নীল নানা রঙের বোতলে সস্তা লেমনেড আর চা বিস্কুট নিয়ে রীতিমত একটা দোকান বসে গেছে। আর কি আশ্চর্য, এই শীতেও যত চাহিদা ঐ দুর্লভ মিঠাপানির।

রূপমতী খাটো শাড়ির আঁচলে বাঁধা খুচরো পয়সা গুণতে গুণতে তাকালো এদিক ওদিক। অর্থাৎ পিয়াস গলার নয়, মনের। খুঁজছিল লালোয়া কুড়ুখকে। ডুফেরী পাল্লার কাজ সেরে সটান এখানেই চলে আসবার কথা তার!

আসবে ঠিকই, জানে রূপমতী। ভিখারিয়ার নাচ আর রূপমতীর নাম— দু-দুটো হাতছানি উপেক্ষা করার মত ছাতির জোর লালোয়ার মত বাইশ বছরের সাওার অন্তত নেই। তবু একটু অধীর না হয়ে পারে না ও। সাঁঝের আওয়াজ শোনা যায়নি এখনো। ভয় সেটুকুই। কাজ শেষ ক'রে হাতের শাবল নামিয়ে রেখে লালোয়াটা খাদানে বসেই গল্প সুরু ক'রে দেয় কোন কোনদিন, ডিনামাইটের সাবধানী ঘণ্টিটাও শুনতে পায় না। এমন এক ব্লাষ্টিংয়ের সময়েই কয়লার সীম চাপা পড়ে মারা গেছে রূপমতীর আঠারো বছরের জোয়ান ভাই হরবন্‌শী।

এদিক ওদিক খুঁজে আবার গিয়ে আসরে বসলো রূপমতী। টের পেল না ভিড়ের মধ্যে চুপচাপ বসে কোথায় লালোয়া কুড়ুখ এক মনে তোতা আর ম্যোরের গান শুনছে। ভিড়ের গলায় গলা মিলিয়ে হো হো ক'রে হেসে উঠছে থেকে থেকে।

ভিখারিয়া জমে উঠলো এদিকে। সন্ধ্যা নামলো। ঘন হ'ল অন্ধকার। আর মূল গায়েন থেকে সবাই এসে একে একে দেখা দিয়ে গেল।

এদিকে রূপমতী, ওদিকে লালোয়া—ভিখারিয়ালাদের মুখে অপরের কুৎসা শুনে হাসছিলো হো হো ক'রে। কিন্তু কে জানতো সে গানের ধুয়ো ঘুরে ঘুরে রূপমতীতে এসে ঠেকবে।

"বাঁশরিয়ার রূপমতী, মোতির মত তার রূপ। ঝিনুকের ভেতর যেমন আড়াল থাকে মোতিয়া, তেমনি চুপছাপ মন রূপমতীর। গরীবে কুড়িয়ে পায়, তারপর হাতে হাতে ঘুরে রাজার আঙুলে গিয়ে শোভা পায় সে মোতিয়া। মন-চুপছাপ রূপমতী হাতে হাতেই ঘুরছে এখন, কিন্তু মন জানে ওর রাজার হদিশ।"

এত কাব্য ক'রে বলবার লোক ত নয় ভিখারিয়ার নাটুয়ারা। তাই গানটা কেমন যেন অসহ্য লাগলো লালোয়ার। অপেক্ষা করলো কেউ জবাব দেয় কিনা শোনবার জন্যে। কিন্তু সবাই শুধু হো হো ক'রে হাসলো। এমন কি রূপমতী নিজেও। আর রাগ সাম্‌লাতে না পেরে হাতের কাছে একটা কয়লার চাঙড় পেয়ে সেটাই ধাঁই ক'রে ছুঁড়ে মারলো লালোয়া, গায়েনকে লক্ষ্য ক'রে।

হৈ হৈ হট্টগোল। আসর সুদ্ধ লোক দাঁড়িয়ে উঠলো উৎকণ্ঠায় আশঙ্কায়। একদল লাঠিসোটা নিয়ে তাড়া করলো গায়েনের দিকে। আরেক দল তাড়া ক'রে এলো লালোয়া কুড়ুখকে।

ফার্ণহোয়াইট, ডিকসন, সাঠে আর সাহানার নেশা জমে উঠেছে তখন। কার হাত থেকে যেন গেলাসটা ছিট্‌কে পড়লো ঝনঝন শব্দ ক'রে। রঙিন চোখ চেয়ে ব্যাপারটা ঠাহর করবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো সাঠে। টলতে টলতে দু' কদম এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলো, ক্যা হুয়া? চিল্লাতা কাহে?

কেউ হয়তো শুনলো না তার কথা। উত্তর দিলো না কেউ।

রূপমতীও ভয়-কাঁপা চোখে তাকিয়ে দেখছিলো। কি করবে, কি করা উচিত কিছুই যেন ঠিক করতে পারলো না প্রথমটা। তারপর চোখজোড়া লালোয়ার মুখের উপর পড়তেই ভিড়ের দিকে ছুটে যাবার জন্যে পা বাড়ালো ও।

আর পরমুহূর্তেই থেমে পড়তে হ'ল।

কাঁধের ওপর ভারী হাতের অনুভব পেয়েই ফিরে তাকালো রূপমতী।

ফার্ণহোয়াইটের ছেলে ম্যাকুসাহেব বললে, যাও মাৎ।

ব'লে, রূপমতীর হাত ধরে ডাক দিলো, চলো ডেরামে, ভাগ চলো রূপমটি।

এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলো রূপমতী, পারলো না। অসহায় চোখ মেলে ও শুধু তাকালো ম্যাকুসাহেবের মুখের দিকে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ভিড়টা যেন রূপমতীর দিকে ভেঙে পড়লো। লালোয়া কুড়ুখের ওপর যত রাগ, সব এসে পড়লো রূপমতীর ওপর।

পাপ যদি না করেছে তো রূপমতীর নামে ছড়া বাঁধবে কেন ভিখারিয়ারা, কুইলায় চাঙড় ছুঁড়বে কেন লালোয়া কুড়ুখ। ও হ'ল সান্তাল, সাথাসাথী কিসের এত লালোয়ার সঙ্গে! আসরটা ভাঙে দিবার তরেই তৈরী ছিল কুড়ীটো। বলাবলি করলো সকলে।

ব'লে রূপমতীর দিকেই ছুটে এলো দলটা।

পাশ থেকে মরিয়ম ফিসফিস ক'রে বললে, পালায় যা তু পালায় যা রূপমতী।

আর ম্যাকু বললে, আও, চলে আও রূপমটি। ব'লেই ওর হাত ধরে টানতে টানতে অগ্নিকুণ্ড ছাড়িয়ে অন্ধকারে নেমে পড়লো।

নির্জন ফাঁকা মাঠের অন্ধকারে এসেই পা থেমে পড়লো রূপমতীর। অস্ফুটে বললে, লালোয়া? লালোয়ার কি হবেক সাহেব? পরমুহূর্তেই ম্যাকুর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললে, আমি আছি ইখানে, লালোয়াকে তু বাঁচারে সাহেব! কান্না এলো যেন ওর গলা ঠেলে।

—ডরো মাৎ।

রূপমতীর পিঠে ভারী হাতখানা রেখে সান্ত্বনা দিলো ম্যাকু।

আর এই সময়েই বাতাস চিরে একটা বন্দুকের আওয়াজ হ'ল।

থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো রূপমতী। ম্যাকুসাহেবের চওড়া বুক টের পেল ঝ'ড়ো পায়রার ছটফটানি।

আশ্লেষ শিথিল ক'রে ম্যাকু বললে, যাও ডেরামে যাও, রূপমটি। লালোয়া বাঁচেগা। ব'লেই আসরের দিকে ছুটতে সুরু করলো সে।

বেশ কিছুক্ষণ অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ডেরার দিকেই পা বাড়ালো রূপমতী।

লালোয়া বাঁচলো, কিন্তু ভিখারিয়াদের টাঙির ঘায়ে জখম হ'ল তার একখানা হাত। আর জখম হ'ল সান্তালপট্টির মান-ইজ্জৎ।

রূপ-ঝরানো ফুর্তি নিয়ে হাসি হাসি মুখে হেলেদুলে বেড়াতো রূপমতী। ফার্নহোয়াইট বা ডিকসন হঠাৎ যদি বা কখনো খাদে নেমেছে কয়লার সীম পরীক্ষা করতে, কিংবা ওভারবার্ডেনের স্তূপ ডিঙিয়ে দেখতে গেছে ঠিকাদারের 'সাক্ষী'র নাপী ঠিক ঠিক হয়েছে কিনা তো মাথার ঝুড়ি ফেলে বড়ো বড়ো

চোখের কৌতুক আর কৌতুহল মেলে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছে রূপমতী, সাহেবের মুখপানে চোখ এঁটে। শনিচারীর হাটে হড়ু কিনতে গিয়ে ফিরেছে রঙিন কাচের জলচুড়ি নয়তো গলায় পুঁথিআঁটা হাঁসুলি পরে। কেউ সন্দেহ করেনি, দোষ দেখেনি কেউ। খাদানের রেজা, কদমে কদমে তার চোখ রাখলে চলে না। মন জুগিয়ে চললে তবেই ঘরে চালের জোগান আসে, সে খবর সবাই জানে। তা ব'লে এমন বে-আব্রু হয়ে ইজ্জৎ হারানো?

ভিখারিয়ার গায়েন কিনা ছড়া বাঁধলো রূপমতীর নামে? সান্তালপট্টির মান রইলো কোথায় তা হ'লে?

বুড়ো চুন্দু হাঁসদা পঞ্চায়েৎ ডাকলো। ডাকলো রূপমতীর বাপ মাধো সোরেনকে।

আর সে খবর দিয়ে গেল রূপমতীর সই সোনা মিরু।

বললে, পঞ্চায়েৎ ডাকছে বুড়ো চুন্দু।

—কানে? বিস্ময়ে চোখ কপালে তুললো রূপমতী।

সোনা মিরু হেসে বললে, ভিখারিয়ার রাতে ম্যাকুসাহেবের সাথে পাপ কএরছিস স্মরণ নাই তুয়ার?

—হঁ। হাসলো রূপমতী। বললে, পঞ্চায়েৎ বসুক গিয়া। কাল চুন্দু বুড়ার ঘাড়ে বাক্‌টো ফেলায় দিব, হুঁ।

কিন্তু ঘাড়ে বাকেট ফেলে দিয়ে চুন্দু বুড়োকে মেরে কি হবে, দুর্নাম রুখবে কে।

সারনাতলায় পঞ্চায়েৎ বসলো, আর পঞ্চায়েতের লোক এক কথায় বিচার দিলো।—বিটলা।

মাধো সোরেন ফিরলো মাঝরাতে। মেয়েকে ডেকে কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, রূপমতী।

—কি আপুং?

মাধোর চোখ সজল হ'ল।—পঞ্চায়েৎ বিটলার বিচার দেছে রূপমতী!

—বিটলা? হতাশ চোখ মেলে প্রশ্ন করলো রূপমতী।

—বিটলা? চমকে উঠলো ম্যাকুসাহেব খবরটা শুনে।

খাদানের কাজ সেরে ফেরবার সময় ম্যাকুকে খবরটা জানাতে গিয়েছিল সোনা মিরু।

সোনা মিঞ চোখ মুছে বললে, হ সায়েব তুই পাপ কএরছিস, তু ইবার বাঁচা উয়ারে।

কিন্তু বাঁচাতে বললেই তো বাঁচানো যায় না।

ছুটো টান দিয়েই সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো ম্যাকু। জেলেকনাইটের কাঠের বাক্সটা টেনে নিয়ে বসলো তার ওপর। আর টিপলারে যেখানে কয়লার স্তূপ জমছে বাকেট উল্টে উল্টে, সেদিকে তাকিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলো, কি করা উচিত।

তারপর হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো ম্যাকু। ধীরে ধীরে নিজেরই অজ্ঞান্তে কখন পট্টির দিকে পা বাড়ালো।

শুধু পট্টির হুকুমই নয়, পাঁচ গাঁয়ের মানকি তখন পঞ্চায়েতের বিচার দিয়ে দিয়েছে।

ভিখারিয়ার গানই নয়, হৈ হল্লার সুযোগ নিয়ে রূপমতী ম্যাকুসাহেবের সঙ্গে আঁধারে গা ঢাকা দিয়েছিল কেন তা নাকি কারো বুঝতে বাকি নেই।

অতএব। বিটলা।

বিচার শুনে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো রূপমতী। যে লোকগুলো এত ধরম অধরমের কথা বলছে, ও জানে এরাই এসে ইজ্জৎ কাড়বে ওর। ক্ষিদের যন্ত্রণায় কিংবা রোগে ভুগে ভুগে যখন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে ও, তখনও দয়া মায়া দেখাবে না কেউ।

বিটলা! বিচার দিলো বড়ো পঞ্চায়েৎ। আর সঙ্গে সঙ্গে সারা গাঁয়ের ছেলে ছোকরারা দলে দলে বাঁশি আর মাদল বাজিয়ে নাচতে নাচতে ঘিরে ফেললো রূপমতীকে। আর তার পিছনে পিছনে আরেক দল এলো তীর ধনুক উঁচিয়ে।

ঠাট্টা বিদ্রূপ হাসাহাসি। আর অশ্লীল গান। কেউ তীরের খোঁচা দিলো কেউ টানলো তার শাড়ির আঁচল।

আর মাঝে মাঝে হৈ হৈ চিৎকার।

বাচ্চা ছেলেগুলোও ছড়া কাটতে সুরু করলো। ছ'হাত তুলে চিৎকার করতে করতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো তারা রূপমতীর ওপর।

এদিকে বাঁশ পোঁতা হ'ল রূপমতীর ডেরার সামনে। পোড়া কাঠ, পুরোনো ঝাঁটা, আর ভাত খাওয়ার পর ফেলে দেয়া শালপাতা বেঁধে দেয়া

হ'ল বাঁশের ডগায়। কেউ উনোন ভাঙলো, কেউ হাঁড়ি কড়াই টুকরো টুকরো করলো।

কিন্তু তারপর, তারপর পাড়ার মেয়েরা পালালো সেখান থেকে। যে যার ঘরে ঢুকে কপাট বন্ধ করে দিলো, লজ্জাশরমের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে।

উলঙ্গ লোকগুলোর কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী দেখে কিন্তু স্থির থাকতে পারলে না ম্যাকু।

গাছটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দাঁতে দাঁত চেপে বললে, বীস্টস্।

যাকে সামনে পেলো ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো। তারপর শাড়িটা কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিলো রূপমতীর গায়ে।

ম্যাকু সাহেবকে দেখে ভয়ে থেমে পড়লো সবাই।

গায়ে কাপড়টা কোন রকমে জড়িয়ে নিয়ে দাঁড়ালো রূপমতী। কপাল থেকে ঝর ঝর রক্ত পড়ছে তখন। সারা গায়ে কাদা।

ম্যাকু এগিয়ে এসে শক্ত করে ধরলো রূপমতীর একখানা হাত। তাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে তুললো বাংলোয়।

ফার্নহোয়াইট বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। বিস্ময়ে কপালে ভ্রূ তুলে তাকালেন। অর্থাৎ কি ব্যাপার?

বাউণ্ডুলে ম্যাকু এক মুখ হেসে বললে, মাই লেডী লাভ, মাই ওয়াইফ।

তারপর বললো সব ঘটনাটা।

শুনে হাসলেন ফার্নহোয়াইট।—এ প্রাইজ ইণ্ডিড, এ প্রাইজ ফর ইওর শিভাল্‌রি। বলে সামনের টুল থেকে হুইস্কির গেলাসে আরেকটা চুমুক দিলেন।

কথাগুলো শুনলো রূপমতী, কিন্তু বুঝলো না কিছুই। কৃতজ্ঞতার চোখ মেলে ও শুধু তাকালো ম্যাকুর দিকে, অপমান আর নির্যাতনের হাত থেকে যে ওকে বাঁচিয়েছে।

রাতটাও কাটলো ফার্নহোয়াইটের বাংলোতেই, যে বাংলোর কোণের ঘরে ওঁরাওদের খিস্টানী মেয়ে মেরিয়ার রাত কাটতো।

রূপমতীর কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিলো মেরিয়া।—সাহেবের বেটার নজর পড়ছে তুর উপর, ডর নাইরে রূপমতী।

ডর নাই ? যত ডরডর তো সেইজন্তেই। খাদানের কাজের ফাঁকে হাসি দিল্লাগী এক জিনিস আর তার বাংলোয় রাত কাটানো অন্ত।

পীরিত ওর লালোয়া কুড়ুখের সঙ্গে। ঠিগিয়া হবে দু' কুড়ি টাকা জমলেই। তা নয়, ম্যাকুসাহেব হাসতে হাসতে এসে বলে কিনা রূপমতীকে সাদী করবে ও।

বেজাত খিস্টানের সঙ্গে সাদী ? লালোয়াকে মুছে ফেলে ম্যাকুসাহেবের সঙ্গে মিতালী পাতাতে হবে ?

মেরিয়া বোঝালো রূপমতীকে।—ম্যাকুসাহেবের বাপটা আমারে সুখে রোখছেরে রূপমতী, বেটাও সুখে রাখবেন তুয়ারে। বলছে বিয়া করবে বটে।

শুনে ভয়ে কাঁপলো রূপমতী।

শিকল ছিঁড়ে পালালো ফার্নহোয়াইটের বাংলো থেকে।

হোক্ বিটলা। পট্টিই ভালো ওর। তবু তো লালোয়া কুড়ুখের সঙ্গে দেখা করতে পাবে লুকিয়ে।

আর, আর বুড়ো বাপ মাধো সোরেন। তাকে ফেলে কিনা সুখের ঘর বাঁধবে রূপমতী ?

অন্ধকারে শরীর লুকিয়ে ফিরে গেলো রূপমতী। পা টিপে টিপে ঝাঁপি সরালো, ঢুকলো ভেতরে।

মাধো সোরেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে তখন কাশছে খুক খুক করে। আর জ্বরের ঘোরে গোঙাচ্ছে থেকে থেকে।

রূপমতী ডাকলো ধীরে ধীরে।—আপুং।

—রূপমতী ? চোখ খুললো মাধো।

রূপমতী এগিয়ে এলো কাছে, বাপের নির্বিকার মুখটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ও। দেখলো মাধো সোরেনের দু' চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

আশঙ্কায় আগ্রহে প্রশ্ন করলো, আহার পাইছোন না আপুং ?

মাধো বিষণ্ণ হাসি হেসে মাথা নাড়লো।

তারপর ধীরে ধীরে সব কথা বলে গেল মাধো। বিটলা হয়েছে রূপমতী। তাই মাধোর ঘুন্সিতে কড়ি থাকলেও দাম নাই তার। হাটের লোককেও জানিয়ে দিয়েছে পঞ্চায়েৎ। হড়্ বেচবে না কেউ ওকে, সিম-সিমারি কিনবে না।

—পাটির সকল ডাইনী ঝুলছে তুয়ারে। ডাইনীর বাপে ভুখা মরতে হবেক।

—সোনা মিরু ? আশায় আশায় প্রশ্ন করলো রূপমতী।

হাসলো মাধো।—ধুমকুড়িয়ার মায়া বটে সোনা, পঞ্চায়েতে ডর নাই উয়ার ?

দীর্ঘশ্বাস ফেললো রূপমতী। পঞ্চায়েতের ভয়ে সাহায্য তো দূরের কথা, দেখা হলে কথাও বলবে না কেউ, জিনিষ বেচবে না দোকানী। শুধু বিদ্রূপ আর অত্যাচার। না খেতে পেয়ে তিলে তিলে মরতে হবে।

সে সাংঘাতিক দৃশ্য দেখেছে রূপমতী।

তবু আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করলো। হয়তো লালোয়া কুড়ুখ আসবে, সব বিপদ থেকে তাকে বাঁচাবে।

কিন্তু লালোয়ার দেখা মিললো না। পঞ্চায়েতের শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে আসতে সাহস পেল না হয়তো।

শুধু সোনা মিরু একদিন গভীর রাতে লুকিয়ে এসে খাবার রেখে গেল। আর চাপা গলায় বলে গেল,- ইখান থাকে পালায় যা রূপমতী, তু পালায় যা। উয়ারা সব দল বাইন্ধা হামলা করবে তুয়ার পরে, আমি শুনছি।

ভয় চাপা গলায় বললে সোনা মিরু, ভয় বাড়িয়ে দিলো রূপমতীর।

কিন্তু কি করবে রূপমতী ? কি করতে পারে।

সারা রাত বসে বসে ভাবলো ও। তবু বুড়ো বাপ মাধো সোরেনকে ফেলে যেতে মন চাইলো না।

পরের দিন সোনা মিরুর কথাই ফললো। রাত না বাড়তেই রূপমতী হৈ হল্লা শুনতে পেলো। দল বেঁধে আসছে সবাই। ঝাঁপির ফাঁকে চোখ রেখে দেখলো রূপমতী। কুৎসিত উত্তেজনার হাসি চমকে উঠছে তাদের মুখে চোখে।

আর বুড়ো মাধো সোরেন নিঃশ্বাস চেপে ভয়ে ভয়ে বললো, পালায় যা রূপতী, তু পালায় যা।

পিছনের ঝাঁপি খুলে পালালো রূপমতী। বুড়ো বাপের দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে ছুটে পালালো অন্ধকারে।

ম্যাকুসাহেবের বাংলোর পথ ধরে।

ম্যাকুসাহেব ওকে বিয়া করবে বলেছে, ম্যাকুসাহেব ওকে আশ্রয় দেবে।

ওরাঁওদের খিস্টানী মেয়ে মেরিয়া বলেছে, সাহেবের বেটার নজর পড়ছে তুর ওপর, ডর নাই-রে, সুখ্যে রাখবেন।

সব কানাকানি খেউর হল্লা চুপ হয়ে গেল।

পঞ্চায়েৎ বললে, মানকির বিচার মিছা হয় না। পাপ কএরছিল রূপমতী, আখন পাপীর ঘরে ঠাঁই পায়েছে।

কোলিয়ারির কুলিকামিনরা বললে, বিটলাটো ঠিকই হইছে, কিন্তুক ডাইনী ইবার হামাদের মজুরী কাটবেক। বুড়া সাহেবের বেটার ঘরণী হইছে উও।

ম্যাকুসাহেবের ঘরণী হয়েছে রূপমতী, খবরটা শুনলো উঁচুতলার লোকরাও।

ডিকসন সিগারেটের টুকরোটা জুতোয় মাড়িয়ে বললে, ন্যুইসেন্স। একটা সাঁওতাল গার্লকে কিনা বাংলোয় নিয়ে গিয়ে তুলতে দিলো ফার্নহোয়াইট?

মিশিরজী আর সাহানা চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে হাসলো। অর্থাৎ বুড়ো নিজেই বা কম কি! মেরিয়া?

কম্পাসবাবু চোখ কুঁচকে কি যেন ইঙ্গিত করলেন।

আর সোনা মিরু এসে বসলো লালোয়া কুড়ুখের ক্লান্ত গাঁইতিটার পাশে। কোমরের গামছাটা খুলে পাখার মত নাড়তে নাড়তে বললে, জোয়ান মানুষটো সায়েবের ডরে লুকায় থাকবি?

দীর্ঘশ্বাস ফেললে লালোয়া। বললে, সমঝায়ে দেখ তুই, কুমাণ্ডির খাদানে কাম মিলবেক বটে, ধাওড়ায় ঘর মিলবেক। বিটলার ডর নাই।

সোনা মিরু বললে, হুঁ সমঝাবো রূপমতীরে। কিন্তুক তুয়ার দুইটো হাতে ঘর বাঁধবার হইল নাই, একটো হাতে কি ঘর বাঁধবার পারবিন? কাটা হাতটার দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হাসি হাসলো লালোয়া।

কিন্তু রূপমতী বুঝল না।—লালোয়া? শুনে খিলখিল করে হেসে উঠলো ও। বললে, ওটা মরদ বেটেক না ধুমকুড়িয়ার কুড়ী? বিটলার সুময় যাতে পারে নাই টাঙ্গি লিয়ে?

শুনে আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো লালোয়া। তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে নিজেই গিয়ে হাজির হল বাংলোর বাগানে।

ফার্নহোয়াইটের বাচ্চা মেয়েটার পেরাম্বুলেটর ঠেলছিল রূপমতী

প্রথমটা চিনতে পারে নাই, ভাবছিল আয়াটাকেই জিজ্ঞেস করবে রূপমতীর খবর। কিন্তু বাঁক ঘুরে রূপমতী সামনাসামনি হতেই সারা মুখ ম্লান হয়ে গেল লালোয়ার।

মাজা ঘষা রূপ, তকতকে ফর্সা একখানা শাড়ি, চুলে যত্নের চাকচিক্য।

লালোয়া বললে যা বলবার। অনুনয়, অনুযোগ।

আর রূপমতী শুধু অসম্মতির ঘাড় নাড়লো।

—ম্যাকুসাহেব কে তুয়ার, ও কি বিয়া করবে সান্তাল কুড়ীকে?

রূপমতী হাসলো। বললে, হঁ। গির্জায় যায়ে খিষ্টান হবো, ম্যাকুসাহেব বলছে উ আমার হাসবাঁধ বটে।

সত্যিই হ'ল তাই। শুনলো কোলিয়ারির সবাই। সুন্দরগড়ের সাদা-আলখাল্লা পাত্রী সাহেব বাইকে চেপে এসে হাজির হ'ল একদিন, ছোট গির্জার অল্টারের সামনে দাঁড়িয়ে কি বলে গেল কিছুই বুঝলো না রূপমতী। শুধু বুঝলো ওর নতুন নাম হ'ল রেবেকা। রূপমতী থেকে রেবেকা। সান্তাল থেকে খিষ্টানী।

খুশিতে উছলে উঠলো রূপমতীর মন। পরের রবিবারেই ওদের বিয়া। তারপর? তারপরই ওকে রেবেকা মেমসায়েব বলবে সকলে? খাদানের কুলিকামিনরা। আর পঞ্চায়েতের যারা বিটলার জন্যে চিৎকার করেছিল তারাই সেলাম জানাবে দেখা হ'লে।

এ যেন হারানো ইজ্জৎ ফিরে পাওয়া। লালোয়ার সঙ্গে ঠিগিয়া হ'লে কি এ সম্মান পেতো ও? সারা জীবন শুধু ভয়ে ভয়ে কাটাতে হ'ত। কে কি কানাঘুষা করে, কে কি বিচার দেয়।

ম্যাকুর কাছে কতবারই তো শুনেছে ও, বিয়ের পর ম্যাকু হবে ওর হেরেল, স্বামী। খিষ্টানী ভাষায় যাকে বলে হাসবাঁধ। অর্থাৎ হাসব্যাণ্ড।

আমলকীর ঝিরঝিরে পাতার ফাঁকে বাঁকা চাঁদের জ্যোৎস্নায় রূপমতী সব ভুলে গেল। ভাবলে, সুখের জীবন বুঝি মোড় নিলো এবার।

কিন্তু ভুল ভাবলো রূপমতী।

কোলিয়ারির চাকরি তো জুয়ার টাকা। আসতে যেতে সময় লাগে না। হিসেবের গলদ ধরা পড়লো, কোলকাতার আফিস জানালো ফার্নহোয়াইট বিদায় নিতে পারে চাকরী থেকে।

ফার্নহোয়াইট ছেলেকে ডেকে বললো, চাকরী যাক দুঃখ নেই। দুঃখ শুধু টাকাগুলো ওড়ানোর জন্যে। তুমিও তো রোজগারের ধার দিয়ে গেলে না।

চুপ করে রইলো ম্যাকু!

ফার্নহোয়াইট বললে, তল্পিতল্পা বাঁধতে হবে এবার। ভাবছি, বাঙ্গালোরে গিয়ে থাকবো, আর যদি চাকরি একটা পেয়ে যাই ভালই।

—আমি? প্রশ্ন করলো ম্যাকু।

—হ্যাঁ, তোমার ব্যবস্থাও করেছি। তোমার বোন ডোরা এসে পৌঁছবে এই সপ্তাহেই। তার সঙ্গে আসছে পার্সিভালের মেয়ে সিলভিয়া।

—তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক?

ফার্নহোয়াইট হাসলেন।—তার যোগ্য হতে পারো তো পার্সিভাল নিশ্চয় একটা রেলের চাকরি তোমাকে দিতে পারবে।

—বিয়ে?

—কপালে চোখ তুলছো কেন? লাভ ইজ্‌ণ্ট সামথিং ইম্পসিব্‌ল্!

মৃদু হেসে ফার্নহোয়াইট বললেন, রেবেকার কথা ভাবছো? ওটা কি বিয়ে নাকি? রোজগারের টাকাগুলো নষ্ট করেছি বটে, কিন্তু তোমার পাগলামির জন্যে দু' পাঁচশো টাকা খেসারৎ দেবার সঙ্গতি এখনো আছে।

শুনে কি একটা দাঁতে চিবোনো কটূক্তি করে সরে পড়লো ম্যাকু।

কিন্তু দিনকয়েক পরেই যখন ডোরার সঙ্গে সিলভিয়াও এসে পৌঁছলো, ম্যাকুর হঠাৎ মনে হ'ল বাপের কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়। আর ফার্নহোয়াইট রূপমতীকে ডেকে বললেন, চৌকিদারের ঘরটা খালি আছে, এ'কটা দিন এখানে থাকবে।

খুশী মনেই রাজী হ'ল রূপমতী। সত্যি তো। মেয়ে এসেছে, এসেছে মেয়ের সাথী। ও থাকলে বেমানান হবে বড়ো। আর অসুবিধেও হবে, হবে রূপমতীর নিজের।

সেই কথা বুঝিয়েই একদিন লরীতে মালপত্র তুললেন ফার্নহোয়াইট। ডোরা আর সিলভিয়া আগেই চলে গিয়েছিল। তাই বিদায়-মুহূর্তে রূপমতীর কান্না-ঝরা চোখ মুছিয়ে দিলো ম্যাকু। বাপের চোখ এড়িয়ে নিজের চোখও মুছলো হয়তো।

বললে ফিরে আসবো এক সপ্তাহের মধ্যেই। তারপর নিয়ে যাবো আমার রেবেকাকে।

সজল চোখে আনন্দের হাসি দেখা দিলো রূপমতীর।

যাবার সময় এক গোছা নোট গুঁজে দিলো ম্যাকু রূপমতীর হাতে।

লরী ছেড়ে দিলো, পিছনে পিছনে ফার্নহোয়াইটের ছোট্ট মোটরখানাও।

কিন্তু ম্যাকু ফিরলো না আর।

ফার্নহোয়াইটের জায়গায় মাস কয়েক পরে এলেন মিস্টার পেরেরা। এসেই বাবুর্চিকে বললেন, চৌকিদারের ঘর থেকে সান্তাল মেয়েটাকে তাড়াও।

রাঙা টুকটুকে বাচ্চাকে বুকে আঁকড়ে চোখ রাঙালো রূপমতী। বললে, কে জানিস আমি? ম্যাকু সায়েব আমার হাসবাঁধ।

শুনে হাসলো বাবুর্চি, হাসলেন মিস্টার পেরেরা। মিশিরজী, সাহানা, কম্পাসবাবু সবাই হাসলেন। আর ঠাট্টা বিদ্রূপের ছড়া বাঁধলো সান্তাল পট্টির মেয়েপুরুষ।

হাসবাঁধন। সব বাঁধন ছিঁড়ে পালিয়েছে ম্যাকু, তা কি এখনো বোঝেনি নাকি মেয়েটা?

হাসলো সবাই, হাসলো না শুধু একজন।

লালোয়া কুড়ুখ।

গির্জার সামনের ঘরটায়, যেখানে বাচ্চা কোলে নিয়ে উঠে আসতে হ'ল রূপমতীকে সেখানেই ভীরু ভীরু চোখে উঁকি মারলো সে একদিন।

রূপমতীর চাটাইয়ের এক কোনে ভয়ে ভয়ে বসলো লালোয়া। বললে, চল রূপমতী, ইখান থেকে কুমাণ্ডীর খাদানে চলে যাই।

চোখ রাঙালো আবার রূপমতী। বললে, পাপের কথা সান্তাল কুড়ীদের সাথে বলবি, আমি খিস্টানী বটি, পাপ করি না আমি। ম্যাকু সায়েব আমার হাসবাঁধ।

সোনা মিরুও এলো একদিন দেখা করতে।

বললে, খাবি কি রূপমতী? খাদানে কাম নিবি তো চল্, মুনশিরে বলি।

—খাদানের কাম? চোখ কপালে তুললো রূপমতী। বললে, আমার না ম্যাকু সায়েবের সাথে বিয়া হইছে। ম্যাকু সায়েবের ইজ্জৎ খতম্ করতে চাস তুরা?

—ম্যাক্‌সায়েবের ইজ্জৎ? রাগে দাঁতে দাঁত চাপলো সোনা মিরু।—উ আর ফিরবে নাইরে, উ আর ফিরবে নাই।

অবিশ্বাসের হাসি হাসলো রূপমতী।—ম্যাক্‌সায়েব মানুষটারে তুরা বুঝিস নাই বটে। ও আমারে কয়ে যাছে। কয়ে যাছে ফিরওা আসবে।

কিন্তু ফিরলোনা ম্যাক্‌সায়েব। আর ম্যাক্‌সায়েবের ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্যে অনাহারে, অভাবে দারিদ্র্যে রূপ হারালো রূপমতী। দিনের পর দিন স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লো তার।

লালোয়া কুড়ুখ এলো একদিন। বসে গল্প করলো অনেকক্ষণ, তারপর অনুরোধ জানালো কুমাণ্ডির খাদানে যাবার।

আর সে কথা হেসে উড়িয়ে দিলো রূপমতী।

কিন্তু হাসি মুছে গেল ক্রমশঃ তার মুখ থেকে।

ফিরলো না ম্যাক্‌।

তবু ম্যাক্‌র বাচ্চাকে মানুষ করে তোলবার স্বপ্ন দেখলো রূপমতী। এক ইঁটের দেওয়াল দেয়া দেহাতী গির্জার পশ্চিমের ছোট্ট ঘরটায় চাটাইয়ে শুয়ে শুয়ে দিনের পর দিন স্বপ্ন দেখলো।

ছেলে বড়ো হবে, খাদানের সাহেব হবে তার ছেলে। সোনা মিরু বলে কি না খাদানে কাজ নিতে। নিজের মনেই হাসলো রূপমতী। সে হ'ল ম্যাক্‌ সাহেবের বৌ, ইজ্জৎ নাই তার?

সুন্দরগড়ের সাদা আলখাল্লার পাদ্রী বাইক ঠেলে ঠেলে আসতো প্রতি রবিবার। বাইবল্‌ পড়ার পর আর আর খিস্টানীদের সঙ্গে রূপমতীও সুর টেনে টেনে গাইতো প্রার্থনার গান, তারপর ইশু বোঙার কাছে বলতো, ম্যাক্‌ সাহেবেরে তাড়াতাড়ি পাঠায়ে দে ইশু বোঙা। পাদ্রী যাবার সময় সান্ত্বনা জানিয়ে যেত। কখনো বা ওঁরাও আর মুণ্ডা খিস্টানীদের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে দিয়ে যেত রূপমতীকে।

সোনা মিরুও আসতো মাঝে মাঝে। এনামেলের থালায় করে ঠাণ্ডি ভাত এনে রাখতো তার পাশে। বসতো, গল্প করতো।

আর বাইরের রাস্তার গাড়ির শব্দ শুনলেই ছুটে আসতো রূপমতী। ঐ বুঝি ম্যাকুসাহেবের গাড়ি এলো। এক মুখ আশা-উজ্জ্বল হাসি নিয়ে ছুটে আসতো রাস্তা অবধি। তারপর মুখ কালো করে দীর্ঘশ্বাস বুকে পুষে ফিরে যেতো।

সোনা মিরুকে বলতো, ফিরবো রে ফিইরা আসবো। বেটার মুখ দেখবারে বাপ না ফিইরা পারবো কানে।

লালোয়াও এসেছে কোন কোনদিন। সোনা মিরুর সঙ্গে। আর ফেরার পথে ওরা বলাবলি করেছে, রূপমতীটো পাগল হইছে।

সোনা মিরুও এসে জানিয়েছে, কাজ না করলে না খেয়ে মারা যাবে রূপমতী। বলেছে, মুনশিকে বলে কাম ঠিক্ করে দেবে।

আর রূপমতী হেসেছে সে-কথা শুনে। ম্যাকুসায়েবের ওড়া গমকে অর্থাৎ ঘরণী কিনা খাদে গিয়ে ঝুড়ি বইবে? তাতে যে ম্যাকুসায়েবের ইজ্জৎ নষ্ট হবে।

এমনি করেই দিনের পর দিন কেটেছে। শেষে মৃত্যুও ঘনিয়ে এলো একদিন।

দুপুরের ছুটির সাইরেন বাজার পর এনামেলের থালায় করে ঠাণ্ডা ভাত নিয়ে এসে সোনা মিরু ঘরে ঢুকেই চিৎকার করে উঠলো রূপমতীর বিভৎস চেহারা দেখে। এনামেলের থালাটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রেখে রূপমতীর বুকের কাছ থেকে তুলে নিলো ফুটফুটে বাচ্চা ছেলেটাকে। তারপর—

চাঁদা তুলে কবর দেয়া হ'ল রূপমতীর। সুন্দরগড়ের সাদা আলখাল্লার পাদ্রী বাইক ঠেলে এলো আবার, বাইবেল্ থেকে দু' লাইন বিড় বিড় করে চলে গেলো।

কবরের নিস্তব্ধতায় নামিয়ে দেয়া হ'ল রূপমতীর মৃতদেহ।

কবর নয়, মাটির ঢিবি। তার ওপর দু' টুক্‌রো কাঠ আড়াআড়ি করে বেঁধে একটা ক্রুশ পুঁতে দেয়া হ'ল।

তারপর খিস্টান পল্লীর সবাই ভুলে গেল রূপমতীর কথা।

ভুললো না শুধু একজন। লালোয়া কুড়ুখ।

কারানপুরার কুলিকামিন, কোড়া কুড়ীরা বলে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় এসে বসতো ও কবরের পাশে, ভয়ে ভয়ে হাত বোলাতো কবরের মাটির ওপর। চোখ থেকে জল ঝরে পড়ে সে-মাটি ভিজে যেতো কোন কোনদিন। তারপর একসময় মাটির প্রদীপটা জেলে দিয়ে চলে যেতো লালোয়া।

খিস্টান পল্লীর সান্তালরা বলে, লালোয়ার দেখাদেখি সোনা মিরুও এসে বসতো কবরের পাশে। রূপমতীর ঘুম ভেঙে যাবে এই ভয়ে একটাও কথা বলতো না সে। শুধু কোন কোনদিন প্রদীপটা এগিয়ে দিতো নিজেই, কিংবা

লালোয়ার হাত থেকে প্রদীপটা নিয়ে চকমকি ঠুকে ঠুকে নিজেই জ্বালাতো সেটা।

সান্তাল পট্টির বুড়হা বুড়হির দল বলে—শালপাতার আড়াল-দেওয়া প্রদীপের শিখাটা জ্বলতো তারার মত, দেখেছে তারা নিজের চোখে, প্রতিদিন দেখতে পেতো।

আর তা দেখে একে একে সান্তাল পল্লীর সবাই এসে বসতে সুরু করলো রূপমতীর কবরের পাশে।

এসে চুপচাপ বসে থাকা, তারপর প্রদীপ জ্বালিয়ে ফিরে যাওয়া।

এ প্রদীপের শিখা সবাই দেখতে পেতো দূর থেকে।

ক্রমশ মুর্গী বলি সুরু হ'ল রূপমতীর কবরের পাশে, পৌষ পরবে নাচ সুরু হ'ল। ওরাও মুণ্ডা সান্তাল হো সবাই মিলে পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিলো রূপমতীর কবর, আর সেই কবরের গায়ে নাম খোদাই করার সময় ঝগড়া বাধলো সাদা আর কালো খিস্টানদের মধ্যে। কালো চামড়ার খিস্টানরাই জিতলো শেষ অবধি। রূপমতী নয়, রেবেকা ফার্নহোয়াইট নয়, মাধো সোরেনের মেয়ে রেবেকা সোরেনের কবর।

বড়ো বড়ো হরফে পাথর খোদাই করে লেখা হল রেবেকা সোরেনের নাম।

আজও কারানপুরার কোলিয়ারিতে রেবেকা সোরেনের কবর ঘিরে সারি সারি প্রদীপ জ্বলে। লালোয়া কুড়ুখের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সবাই।

কিন্তু একটি নাম ডুবে গেছে বিস্মৃতির অতলে। নিভে গেছে শুধু একটি প্রদীপ। যে প্রদীপ শুধু লালোয়া কুড়ুখই জ্বালাতে পারতো।

সে আলো জ্বলতো শুধু সোনা মিরুর বুকে।